সুবোধকুমার চক্রবর্তী

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
শ্রাবণ ১৩৭১ সন
প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯
প্রচ্ছদপট
শ্রীগণেশ বসু
হাওড়া-৪
ব্লক
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং
রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা-৯
প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন্ হাউস
৬৪, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯
মুদ্রক
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বাগ
নিউ নিরালা প্রেস
৪, কৈলাস মুখার্জি লেন,
কলকাতা-৬।

উৎসর্গ

বিদেশের বিলাস ও ঐশ্বর্যে যাঁদের কৌতূহল
তাঁদের হাতে

১

মানুষের জীবনে কখন কী সুযোগ আসে তা কেউ বলতে পারে না। অনেক অপ্রত্যাশিত ঘটনাও ঘটে আকস্মিক ভাবে। আমার জীবনেও হঠাৎ এমনি একটি দিন এলো। ডাক এলো আমেরিকা ভ্রমণের।

বিদেশ ভ্রমণের শখ আমার অনেক দিনের। বন্ধু মনোরঞ্জনকে এ কথা বলেছিলুম। সে আমার কোষ্ঠি বিচার করেছে, হাতের রেখাও দেখেছে ভালো করে। কিন্তু হতাশ করেছে আমাকে। বলেছে, দেশ ভ্রমণ আছে, নেই বিদেশ ভ্রমণের যোগ।

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম : সমুদ্র যাত্রা নেই?

সে বলেছিল : সে যোগ কেটে গেছে।

একটু ভেবে বলেছিলাম : হয়তো তাই। অনেকদিন আগে ওখা থেকে আরব সাগরের দ্বীপ বেট দ্বারকায় গেছি নৌকোয় চেপে। তাতেই বোধহয় সমুদ্র যাত্রার যোগ কেটে গেছে। কিন্তু আজকাল তো জাহাজে চেপে কেউ বিদেশে যায় না, যায় উড়ো জাহাজে। আমার কপালে কি আকাশ যাত্রা নেই?

না

বলে মনোরঞ্জন আমাকে নিশ্চিন্ত হতে বলেছিল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার ভবিষ্যদ্বাণী ফললো না। আমন্ত্রণ এলো আমেরিকা থেকে। আমেরিকা মানে ইউনাইটেড স্টেট্‌স অফ আমেরিকা। আর এতে মনোরঞ্জনের চেয়ে আমিই আশ্চর্য হলাম বেশি।

কী করে এই অভাবনীয় ব্যাপার ঘটলো, তাও অনুমান করতে পারলাম। আমার এক অনুরাগী পাঠক ভ্রমণ কাহিনীর উপরে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, আর সেটি প্রকাশিত হয়েছিল একটি আমেরিকান কাগজে। এই প্রবন্ধটির একটি কপি আমি সেই বন্ধুর কাছেই পেয়েছিলাম। সেটি পড়ে

আমার লজ্জার সীমা ছিল না। যাঁরা বাঙলা জানেন না তাঁরা আমার সম্বন্ধে যে কত বড় ভুল ধারণা করবেন, সেই কথা ভেবেই আমার লজ্জা হয়েছিল। মিথ্যার উপরে তো প্রতিষ্ঠা হয় না, মিথ্যা প্রতিষ্ঠার কোনো মূল্যই নেই। তবু এই মিথ্যার সাময়িক জয় হলো। আমেরিকার একটি সংস্থার কাছ থেকে আমন্ত্রণ এলো তাদের দেশ দেখবার জন্য, আর তারই ফাঁকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গোটা কয়েক বক্তৃতা দিতে হবে। যাতায়াতের খরচ দেবে তারাই। আর বক্তৃতার জন্য যে পারিশ্রমিক দেবে, তা আমাদের কাছে কতকটা অবিশ্বাস্য। ও দেশের সমস্ত খরচ নির্বাহের পরেও অনেক পয়সা উদ্বৃত্ত হবে।

রাজী না হবার প্রশ্নই নেই। জীবনে যত রকমের সুযোগেব জন্য আমরা লালায়িত, তার মধ্যে এ রকম সুযোগের নাম নেই। অন্তত আমার মতো যারা চাকুরিজীবী, তাদের স্বপ্নেও এ রকম সুযোগের স্থান নেই। অথচ এই রকম ঘটনা নাকি আজকাল হামেশাই ঘটছে। সংবাদপত্রের সম্পাদক বার্তাজীবী মাস্টার প্রফেসর ও শিল্পীরা প্রায়ই বিদেশে যাচ্ছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের বড় বড় রুই কাৎলা এবং রাজ্য ও লোকসভার প্রিয় ও ঝগড়াটে সদস্যরাও যাচ্ছেন। বিদেশীরা যেমন এ দেশে জনমত গড়তে চায়, তেমনি আমাদের সরকারও আঁশ-কাঁটা ছড়িয়ে স্বজন ও দুর্জন প্রতিপালন করছেন। শুধু আমার বেলাতেই বোধহয় এ নিয়মের ব্যতিক্রম হলো।

না, বোধহয় ব্যতিক্রম নয়। আমার কাছেও কারও কোনো প্রত্যাশা থাকতে পারে। কেউ হয়তো জিজ্ঞাসা করতে পারে, তাদের আমার কেমন লাগলো। হয়তো বলতে পারে, কিছু লিখতে হবে তাদের দেশের সম্বন্ধে। এ কোনো কঠিন কাজ নয়। ভালো লাগলে চেঁচিয়ে বললেও দোষ নেই, ভালো না লাগলে নীরব থাকলেই হলো। কিংবা একটু ঘুরিয়ে বলা যায়, মন্দ লাগে নি।

কিন্তু যাত্রার দিন স্থির হবার পরে অন্য রকমের দুর্ভাবনা হলো। এর আগে আমি কখনও বিদেশে যাই নি। বিদেশে চলা-ফেরার নিয়ম কানুন আমার জানা নেই। সাধারণ ভারতীয়ের সঙ্গে আমেরিকাবাসীর পার্থক্য

এত বেশি যে সে একটা ভয়েরই কথা। কী করতে কী করে ফেলবো, আর কী বলতে কী বলে ফেলবো, শেষে শুধু নিজের নয় স্বদেশেরও বদনাম হবে। এর আগে যে এ রকম হয় নি তা নয়। রবীন্দ্রনাথের ভক্তরাও রবীন্দ্রনাথকে গালাগালি দিয়ে এসেছেন বলে শুনেছি। নিজের দেশকে হেয় করে এসেছেন অনেকেই।

আমার এই সব ভাবনার কথা শুনে নারায়ণবাবু বললেন : ভয় পাচ্ছেন কেন! চোখ কান খুলে রাখবেন, তাহলেই হবে।

বললাম : নিজের চোখ কানকে তো ভয় নেই, ভয় পরের চোখ কানকে। তারা তাদের চোখ কান দিয়ে আমাদের বিচার করবে।

নারায়ণবাবু বললেন : নিজের মুখ বন্ধ রাখলে পরের চোখ কানকে আর ভয় নেই।

সে খুব কঠিন কাজ। নানা কারণেই যে নিজের মুখ খুলতে হয়।

সব কাজেই খুলুন, খুলবেন না শুধু নিজের কথা বলার জন্যে।

বললাম : আর তো উপায় নেই। ডেকে নিয়ে যাচ্ছে বক্তৃতা দেবার জন্যে, মুখ তো খুলতেই হবে।

নারায়ণবাবু গম্ভীর ভাবে বললেন : উঁহু। মুখ বন্ধ করে বক্তৃতা দেবেন।

সে কি!

আশ্চর্য হবেন না। কয়েকটা বক্তৃতা এখান থেকে লিখে নিয়ে যান। তাই পড়ে শুনিয়ে দেবেন। এ দেশের এমন অনেক কথা আছে, যা শুনলে ওরা অবাক হয়ে যাবে। স্বামী বিবেকানন্দর কথা মনে নেই!

আমি লজ্জা পেয়ে বললাম : স্বামীজীর নাম করবেন না। তিনি যে কোনো দেশে গিয়ে ভারতকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠা করে আসতে পারতেন। করেছেনও। অকালে তিনি মারা না গেলে ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন নিত।

নারায়ণবাবু প্রতিবাদ করলেন না, বললেন : দেশকে ভালবাসলে ঐ রকমই হয়। যাওয়া যখন স্থিরই হয়েছে, তখন এই সব ভয় ভাবনা ঝেড়ে ফেলুন। সহজ হতে পারবেন। ও দেশের ছেলেমেয়েদের এ দেশে ঘুরে বেড়াতে

দেখেন নি ! ওদের কোনো বিধিনিষেধ আছে বলে তো মনে হয় না !
আমি বললাম : আপনি বোধহয় হিপি ছেলেমেয়েদের কথা বলছেন !
নারায়ণবাবু কঠিন ভাবে বললেন : না। আমেরিকান ছেলেমেয়েদের আপনি হিপি ভাববেন না। হিপিদের জাতটাই আলাদা। ওরা শুধু আমেরিকা থেকে আসে না। আসে পৃথিবীর সব সভ্যদেশ থেকে। কেন ওরা ঘর-বাড়ি ছেড়ে ভবঘুরের মতো দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়, কেউ কি তার খবর রাখে !
বললাম : সভ্যতার চরম উৎকর্ষ থেকেই বোধহয় ওদের জন্ম। তাই বোধ-হয় সভ্যতাকেই ওরা আর বরদাস্ত করতে পারছে না।
নারায়ণবাবু বললেন : হয়তো তাই, হয়তো তা নয়। কিন্তু আমি একদল আমেরিকার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেশবার সুযোগ পেয়েছিলাম। ভারি মিষ্টি স্বভাবের ছেলেমেয়ে তারা। পোশাক পত্তরের বালাই নেই, প্রসাধনে সময় নষ্ট করে না মেয়েরা। বলেছিল, মজুরের মতো কাজ করে কিছু টাকা রোজগার করে তারা ভারতবর্ষ দেখতে এসেছে। কে কেমন করে রোজ-গার করেছিল, তাও বলেছে আমাকে।
হেসে বললাম : এ দেশের মজুর তা কোনো দিন পারবে না।
সে অন্য কথা। আমি যা বলতে চাইছি, তা হলো ও দেশের সাধারণ মানুষের কথা। ওরাই আমাকে বলেছিল যে বিদেশীদের সঙ্গে ভাব করতে ওরা খুব ভালবাসে। নিজেদের দেশে বিদেশী দেখলে নানা ভাবে ওরা সাহায্য করতে চায়। তাদের ইচ্ছা যে আমেরিকা সবাই দেখুক, জানুক, আর ভালবাসুক তাদের মতো।
আমি কৌতুকের সুরে বললাম : তবে আর কি ! প্লেন থেকে নেমেই জানিয়ে দেবো যে আমি বিদেশী, তোমাদের দেশ দেখতে এসেছি।
নারায়ণবাবুও হেসে বললেন : ভয় ভাবনার কথা শিকেয় তুলে রেখে দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়ুন।

২

জুন মাসের প্রথমেই বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু সোজা আমেরিকায় নয়। লেনিনগ্রাডের অ্যানা স্মরনভের সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা ছিল। তাই মস্কো হয়ে ওয়াশিংটন যাবার অনুমতি নিয়েছিলাম। লেনিনগ্রাডের কথা আগেই বলেছি। এইবারে আমেরিকার কথা।

তার আগে ইংলণ্ডের কথাও সংক্ষেপে বলতে হয়। লণ্ডন থেকে ওয়াশিংটনের প্লেন ধরবার আগে বিলেতেও এক বন্ধুর কাছে কয়েকটা দিন কাটিয়েছিলাম।

বিলেত বলতে আমরা বৃটিশ আইল্‌স্ বুঝি—ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, ওয়েল্‌স্ ও আয়ার্ল্যাণ্ড। এই বিচ্ছিন্নতার যুগে আয়ার্ল্যাণ্ডের বন্ধন শিথিল হয়ে গেছে। ইংরেজ জাত এখন আর আগের মতো সবল নয়। সে দেশও এখন নানা সমস্যায় জর্জরিত হয়ে উঠেছে।

একদা মিশরের রাজা ফারুক বলেছিলেন যে পৃথিবীতে শুধু পাঁচটি রাজা থাকবে—তাসের চারটি রাজা ও ইংলণ্ডের রাজা। ইংলণ্ডে এখন রাণীর শাসন। কিন্তু তাঁরও অভাব অনটনের খবর পাওয়া যাচ্ছে, তাঁরও বিরুদ্ধে তরুণদের মন্তব্য সোচ্চার হয়ে উঠছে।

কিন্তু এ সব কথা নিয়ে আলোচনা আমি করবো না। তাড়াহুড়ো করে কয়েকটি দর্শনীয় স্থান শুধু দেখে নিয়েছি। সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করবার সময় পাই নি। খবরের কাগজে যা পড়েছি, তা নিজের অভিজ্ঞতার কথা বললে খুবই ভুল হবে।

বিলেতের মানুষের সম্বন্ধে আমার একটা মোটামুটি ধারণা ছিল। নিজেদের দেশেই সে ধারণা হয়েছে। খুব রাশভারি ও স্বল্পবাক্ এরা, কিন্তু উত্তম প্রচুর। এরা কাজটাকেই ভালো চিনেছে, কাজ নিয়েই মেতে থাকে। এ দেশে এক সময় এরা রাজার জাত ছিল। তাই আজও আমাদের দেশে

এদের চালচলনে খানিকটা রাজকীয় ভাব আছে।

ইংরেজী গল্প উপন্যাসেও আমি এদের কথা পড়েছি। স্বামী-স্ত্রী মুখোমুখি না বসে হয়তো বসেছে পিঠে পিঠ দিয়ে, একখানা খবরের কাগজ পড়ছে ভাগ করে। কোন কথা না বলে স্বামী হয়তো তার হাতের কাগজখানা পিছনে বাড়িয়ে দিলো। স্ত্রীও কোনো কথা না বলে সেখানা হাতে নিয়ে নিজের কাগজখানা দিয়ে দিলো স্বামীর হাতে। তারপর নিজের পেয়ালার কফি শেষ হতেই জিজ্ঞাসা করলো। মোর? মানে, আর একটু চাই? নিরাসক্ত ভাবে স্বামী উত্তর দিলো, নো থ্যাঙ্ক্‌স্‌। মানে, আর চাইনে, ধন্যবাদ। এইখানেই দু'জনের কথাবার্তার শেষ। ছুটির দিনে ইংরেজ দম্পতির কথাবার্তা।

সাধারণ মানুষের কথাও পড়েছি আমাদের দেশের ভ্রমণ কাহিনীতে। বিলেতী জাহাজে ইংলিশ চ্যানেল পার হচ্ছে ইংরেজ ও ফরাসী নরনারী। ইংলণ্ডের ডোভার থেকে ফ্রান্সের ক্যালে যাচ্ছে। বাইশ কিংবা ছাব্বিশ মাইল প্রশস্ত সমুদ্র কয়েক ঘণ্টার পথ। কিন্তু সমস্ত যাত্রী নীরবে চলেছে, কোনো শব্দ নেই কারও মুখে। যেন প্রাণহীন পুতুলে বোঝাই একটা জাহাজ। কিংবা কোনো গভীর শোকে সবাই স্তব্ধ হয়ে বসে আছে।

কিন্তু ক্যালের মাটিতে জাহাজ নোঙর করার পরেই নিমেষে এই দৃশ্য পালটে যাবে। ফরাসীরা সারিবদ্ধ ভাবে নেমে গিয়েই নেচে চেঁচিয়ে সমস্ত জাহাজঘাটা সরগরম করে তুলবে। মনে হবে যেন একদল কয়েদী জেলখানা থেকে এই মাত্র ছাড়া পেয়েছে। নিন্দুকেরা বলে যে ইংরেজ যাত্রীদের মধ্যেও নাকি কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তারা নাচে না, গান গায় না, কিন্তু মনে হবে যে মনে মনে তারাও শিস দিচ্ছে। তাদের মধ্যেও যে প্রাণের সঞ্চার হয়েছে, তা বোঝা যাবে।

এর উল্টো ভাবটাও দেখা যায় ফরাসী জাহাজে ক্যালে থেকে ডোভারে আসবার সময়। জাহাজের মধ্যে আনন্দে মাতলামি করে ফরাসী যাত্রী, আর ইংরেজরা তাদের দেখে বেশ মজা উপভোগ করে। তারপর ডোভারে পৌঁছলেই সব শান্ত। মনে হবে যে একদল মৃত নরনারী জাহাজ থেকে

ইংলণ্ডের মাটিতে নামছে সারিবদ্ধ ভাবে।

এই নাকি সাধারণ ইংরেজের চরিত্র। এ দৃশ্য আমি নিজের চোখে দেখি নি। মস্কো থেকে উড়ে এসে নেমেছি লণ্ডনের হীথরো এয়ারপোর্টে। জাহাজে ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ পাই নি। যা দেখেছি ও জেনেছি, তা বলাও উচিত হবে না। তাড়াহুড়ো করে কিছু জানার চেষ্টা স্বাভাবিক কারণেই ভ্রমাত্মক হয়। নিজের দেশেই আমার এ ভুল হয়েছে। মানুষ চিনতে আমি কোনো দিনই পারি নি। ভণ্ডকে সাধু মনে হয়েছে, আর সাধুকে মনে হয়েছে ভণ্ড। তাই ইংরেজের চরিত্রের কথা থাক। আমেরিকার গল্পই আজ বলি।

হীথরো এয়ারপোর্টেই আমি এক আমেরিকান দম্পতির সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। এয়ারপোর্টে পৌঁছতে আমার বন্ধুর একটু দেরি হবে বলেছিল। তাই কাস্টম্‌স চেকিং-এর পরে বাইরে বেরিয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। এক আমেরিকান দম্পতিও কারও জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। মাঝ বয়সী তাঁরা। সুশ্রী চেহারা, ভদ্রলোকের চেয়ে তাঁর স্ত্রীকে অনেক ছেলেমানুষ মনে হয়েছে। বয়সে না হলেও পোশাক ও প্রসাধনের জন্যেও হয়তো হতে পারে।

আমি তাঁদের আমেরিকান বলে সঠিক ভাবে চিনতে পারি নি। আর দম্পতি বলে অনুমান করেছিলাম পাশাপাশি বসে থাকতে দেখে। আমার মনে হয়েছিল যে এঁরা ইংরেজ নন। ইংরেজদের ধরন ধারণ কিছু অন্য রকম। চেহারাও যেন ঠিক মিলছে না।

বারকয়েক ওঁদের দিকে তাকিয়েই আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছিল তাঁদের কথোপকথনে। ভদ্রমহিলা কী বলেছিলেন শুনতে পাই নি। কিন্তু ভদ্রলোকের উত্তরটা শুনতে পেলাম। বললেন, ওকেয় হানি।

প্রথমটায় বুঝতে পারি নি। ওকেয় শব্দটা আরও দু একবার শোনবার পরে বুঝতে পারলাম যে আমরা সম্মতি জানাতে যে ও কে বলি, ইনি এই শব্দটিরই উচ্চারণ করেছিলেন ওকেয় বলে।

কিছুক্ষণ ভাববার পরে হানি শব্দটিও বুঝতে পারলাম। হানি মানে মধু।

বউকে বোধহয় আদর করে হানি বলছেন।
কেন জানি না, কৌতূহল আমার বেড়ে গেল। এ মহিলা ভদ্রলোকের বউ, না বান্ধবী! তাঁদের কথাবার্তা আরও কিছু শোনবার জন্য উৎকর্ণ হয়ে রইলাম। কিন্তু তাঁরা আমার পাশেই বসে আছেন। আমাকে যাতে কোনো রকম সন্দেহ না করেন, তার জন্য আমি সাবধানে সামনের দিকে চেয়ে রইলাম।
কিন্তু তাঁরা এমন মৃদুস্বরে কথাবার্তা বলছিলেন যে কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। হঠাৎ একটু হাসির সঙ্গে শুনতে পেলাম, ও নো ডিয়ার।
ভদ্রলোক নন, মহিলাটি এই কথা বললেন। আর সেই সঙ্গে তাঁর কানের পাশ দুটো যেন লাল হয়ে উঠলো। মহিলা লজ্জা পেয়েছেন ভদ্রলোকের কোনো কথায়। তাঁদের দিকে চেয়ে দেখলাম যে মহিলার এই লজ্জা ভদ্র-লোক বেশ উপভোগ করেছেন। মুখ টিপে হাসছেন অল্প অল্প। আমিও যেন লজ্জা পেয়ে তখনই মুখ ফিরিয়ে নিলাম।
ঠিক এই সময়েই মহিলাটি লাফিয়ে উঠলেন, আর ভদ্রলোকও উঠে দাঁড়ালেন। দেখতে পেলাম যে কাস্টম্‌স-এর দরজা ঠেলে আর এক ভদ্র-লোক বেরিয়ে এলেন। বুঝতে পারলাম যে ইনি এঁদের বন্ধু। এঁকে নেবার জন্যই এই দম্পতি এয়ারপোর্টে এসেছেন।
কিন্তু এর পরেই আমি একেবারে চমকে গেলাম। কাছে এসে আগন্তুক আমার পাশের ভদ্রলোকের সঙ্গে করমর্দন করলেন না।
হ্যাই জ্যাক!
বলে ভদ্রলোকের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে মহিলাকে অত্যন্ত সহজ ভাবে একটা চুমু খেলেন। যে ভদ্রলোককে তিনি জ্যাক বললেন, তিনি প্রসন্ন-মুখে উত্তর দিলেন, হ্যাই বিল!
সত্যি বলতে কি, আমি নিজের একেবারে পাশে এই কাণ্ড দেখে রীতি-মতো হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। এ কিরে বাবা! পরের বউকে এমন করে সবার সামনে চুমু খাচ্ছে কেন! তারপরেই ভাবলাম, ভুল করি নি তো! যাঁদের দম্পতি ভেবেছি, তাঁরা হয়তো আদৌ দম্পতি নন। এখন যে ভদ্র-

লোক এলেন, তিনিই হয়তো মহিলার স্বামী।

কিন্তু না, তা নয়। আগন্তুক মহিলাকে ডার্লিং বলে সম্বোধন না করে মিসেস হক্স্‌ওয়ার্থ বলে কথা বললেন। প্রমাণ করে দিলেন যে পরিচয়টা বান্ধবী হিসেবেও নয়। বন্ধুর স্ত্রী বলেই পরিচয়। অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভাবে কথা বলতে বলতেই তাঁরা এগিয়ে গেলেন। আর আমি বসে রইলাম হতভম্ব হয়ে।

ব্যাপারটা এইখানেই মিটে যেতে পারত, কিন্তু মিটলো না অন্য কারণে। একজন লালমুখো ইংরেজ যে আমাকে অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ্য করছিলেন, তা পরক্ষণেই বুঝতে পারলাম। এঁরা চলে যাবার পরেই তিনি আমাকে বললেন : তুমি বোধহয় স্টেট্‌সে যাও নি ?

স্টেট্‌স্ মানে ইউনাইটেড স্টেট্‌স অফ আমেরিকা, সংক্ষেপে আমরা আমেরিকা বলি। আচম্‌কা এই প্রশ্ন শুনে আমি চমকে উঠেছিলাম। তারপরে মুখ ফিরিয়ে এই ইংরেজ ভদ্রলোককে দেখে বললাম : হ্যাঁ।

ভদ্রলোক গম্ভীর ভাবে বললেন : সেখানে এ রকম ঘটনা পথে ঘাটে দেখবে।

কথাটা ঠিক বুঝতে না পেরে বললাম : কোন্ ঘটনার কথা বলছেন ?

ভদ্রলোক যেন কিছু বিরক্ত হলেন। বললেন : যে দৃশ্য দেখে বেশ আশ্চর্য হয়েছ, তারই কথা বলছি।

বুঝতে পারলাম যে সবার সামনে চুমু খাবার কথাই তিনি বলছেন। কিন্তু তাঁর এই মন্তব্য শুনে আমি আরও বেশি আশ্চর্য হলাম। খাঁটি ইংরেজের মতো চেহারা। ইংরেজী উচ্চারণেও ইংরেজ বলে নিঃসন্দেহ হচ্ছি। ইংরেজ যে গায়ে পড়ে কথা বলে। এ আমার কাছে আরও আশ্চর্যের ঘটনা বলে মনে হলো। কিন্তু আমি কোনো উত্তর দেবার আগেই ভদ্রলোক তাঁর বক্তব্যটা আরও স্পষ্ট করে বললেন : এরা শেকহ্যাণ্ড করতে জানে না, হাত না বাড়ালে এরা নিজে থেকে হাত বাড়ায় না। কিন্তু মেয়েদের দেখলে যেখানে সেখানে চুমু খায়।

তারপর আমার দিকে চেয়ে সকৌতুকে বললেন : ভালো পার্টিতে গেলে

তুমি মুখ তুলে তাকাতে পারবে না, লজ্জায় তোমার মাথা কাটা যাবে। কিন্তু ওদের কোনো লজ্জা নেই, ওরা তোমার দিকে ভ্রূক্ষেপও করবে না।

তারপর একটু যেন রাগত ভাবে বললেন : এরই নাম আমেরিকা।

কিন্তু আমি এ কথা মেনে নিতে পারলাম না। প্রতিবাদ করবারও সময় পেলাম না। হুড়মুড় করে আমার বন্ধু এসে আমাকে টেনে নিয়ে গেল।

৩

ওয়াশিংটনের প্লেন ছাড়তে তখনও কিছু বিলম্ব ছিল। বেলা বারোটায় প্লেন ছাড়বে। নিজের জায়গায় বসে প্রথম কথাই আমার মনে হলো যে এইবারে আমি আমেরিকা যাচ্ছি। এখান থেকে প্লেন উড়লেই অতলান্তিক মহাসাগর পেরিয়ে এই প্লেন আমেরিকার মাটিতে নামবে।

ভূগোলে আমরা আমেরিকা মহাদেশের কথা পড়েছি। পৃথিবীর যে গোলার্ধে আমরা আছি, তার উল্টো দিকে এই দেশ। তার মানে আমাদের যখন দিন, তাদের তখন রাত। সভ্যতার ব্যাপারেও তাই। ওদের যখন রাত তখন আমাদের দিন ছিল। এখন ওদের দিন, আর আমাদের রাত। উজ্জ্বল দিনের আলো থেকে ওরা অনিশ্চিত অন্ধকারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে কিনা জানি না। আমাদের আকাশে অন্ধকার ঘনিয়ে আছে। এক সঙ্গে আমরা বোধহয় দিনের আলো কখনও দেখবো না।

আমেরিকা মহাদেশেরও দুটো ভাগ আছে, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা। সুমেরু থেকে কুমেরু পর্যন্ত বিস্তৃত এই মহাদেশ। কিন্তু আমেরিকা বলতে এখন আমরা আমেরিকা মহাদেশের সবকটি দেশকে এক সঙ্গে বুঝি না। বুঝি ইউনাইটেড স্টেট্স অফ আমেরিকা নামে একটি মাত্র দেশ। সংক্ষেপে এর নাম স্টেট্স। পঞ্চাশটি স্টেট নিয়ে এই বিরাট দেশটি গঠিত হয়েছে। তার মধ্যে দুটি স্টেট বিচ্ছিন্ন। একটির নাম হলো আলাস্কা, আর একটি হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ। একটি উত্তর আমেরিকার সর্বোত্তরে, রাশিয়ার দিকে

ঝুঁকে আছে। অন্যটি প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে একটি দ্বীপপুঞ্জ। হনলুলু তার প্রধান শহর।

এ কতকটা ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের মতো। কয়েকটি রাজ্য মিলে যেমন ভারতবর্ষ, তেমনি আমেরিকাও কয়েকটি স্টেট নিয়ে গঠিত। প্রায় স্বাধীন এই স্টেটগুলি। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে এরা ভারতবর্ষের মতো কেন্দ্রীয় সরকারের মুখাপেক্ষী নয়।

দেশটা কত বড় সে সম্বন্ধে আমার একটা মোটামুটি ধারণা আছে। আয়তনে ভারতবর্ষের প্রায় তিনগুণ। কিন্তু লোক সংখ্যা ভারতবর্ষেরই বেশি। আড়াই গুণ না হলেও দ্বিগুণের যে অনেক বেশি তাতে সন্দেহ নেই। ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত হলো দু হাজার মাইল। আমেরিকার এর চেয়ে আট শো মাইল বেশি। অতলান্তিক মহা-সাগরের তীর থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে পৌঁছতে পুরো দু দিন সময় লাগে। তার জন্যে একটা ট্রেনকে ঘন্টায় ষাট মাইল বেগে ছুটতে হয়। নিউ ইয়র্ক থেকে সানফ্রান্সিস্কো ট্রেনে দু'দিনের পথ। আর উড়োজাহাজে লাগে মাত্র কয়েক ঘন্টা।

এ সব কথা বেশিক্ষণ ভাবতে ভালো লাগলো না। আমি যাত্রীদের দিকে মনোযোগ দেবার চেষ্টা করলাম। পিছনের যাত্রীদের দেখতে হলে ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে হয়, যেটা ভদ্রতা বিরুদ্ধ। আমি তাই সামনে ও পাশে চেয়ে দেখতে লাগলাম।

অনেক দিন আগে আমি ড্যাকোটা প্লেনে চেপে উত্তরবঙ্গ বা আসামে গিয়েছি। ফকার ফ্রেণ্ডশিপেও চেপেছি। কিন্তু দেশের সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়েছি ট্রেনে ও মোটর বাসে। আমাদের দেশের কোনো জায়গায় যেতে বেশি সময় লাগে না। কলকাতা থেকে দিল্লী পৌঁছতে সময় লাগে এক দিন। আজকাল সতেরো ঘন্টাতেও পৌঁছনো যায়। ম্যাড্রাসে পৌঁছতে লাগে দেড় দিন, আর বম্বে পৌঁছতে কিছু বেশি সময় লাগে। আমেরিকার মতো দ্রুত গতির ট্রেন থাকলে এক দিনেই পৌঁছতো। দেশ দেখার জন্য এই সময় দিতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

যে যুগে প্লেন ছিল না, সে যুগে মানুষ এ দেশ থেকে সে দেশে যেত জাহাজে চেপে। জাহাজেই বিলেত যেতে হতো, বিলেত থেকে আমেরিকা। তখন মানুষ দিনের হিসেব করতো, ঘণ্টার কথা ভাবতো না। আজ আমরা মিনিটের কথা ভাবছি। এই প্লেন আকাশে উড়লে পাঁচ ঘণ্টা ত্রিশ মিনিটে আমেরিকার মাটিতে নামবে। কী আশ্চর্য গতি! এই গতির কথা আমরা ভাবতে পারি না।

এ সব প্লেনের ভিতরটাও না দেখলে কল্পনা করা যায় না। বড় বড় প্লেন আমি উড়তে ও নামতে দেখেছি। কিন্তু এর ভিতরে এত মানুষ যে এমন স্বচ্ছন্দে বসতে পারে, দেশ ছাড়বার আগে আমি তা ভাবতে পারি নি। প্রথম অভিজ্ঞতার মতো বিস্ময় নিয়ে আমি সামনের যাত্রীদের দেখতে লাগলাম।

আমার পাশের সীটটাই খালি ছিল। মনে হচ্ছিল যে সেই সীটের যাত্রী-কন্টিনেণ্টের কোনো শহর থেকে উঠেছেন। এখানে নেমেছেন খানিকক্ষণের জন্য। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে প্লেন ছাড়তে আর দেরি নেই। ভদ্রলোক বোধহয় এখুনি এসে পড়বেন।

এলেনও তাই। তাঁর চালচলনে একটুও তাড়াহুড়া দেখলাম না। কিন্তু কাছে আসতেই আশ্চর্য হয়ে গেলাম। সেই ভদ্রলোক! মিস্টার জ্যাক হক্স্‌ওয়ার্থ যাকে দেখে বলেছিলেন, হ্যাই বিল।

বিল তাহলে ইংলণ্ডে রইলেন না। তিনিও আমাদের সঙ্গে নিজের দেশে চলে যাচ্ছেন। ভদ্রলোক আলাপ করতে ভালবাসেন কিনা জানি না, কিন্তু মুখের ভাবটি প্রসন্ন। তাই দেখে সাহস করে বললাম : গুড মর্নিং। নমস্কারের উত্তর দিয়ে ভদ্রলোক আমার পাশে এসে বসে পড়লেন।

সেদিন যে দৃশ্যটি দেখেছিলাম, সেই সম্বন্ধেই কিছু জানবার জন্য আমার বাসনা জাগলো। কিন্তু প্রথমে আমি কথা বলি নি। ভেবেছিলাম যে সে হয়তো অসৌজন্যের ব্যাপার হবে। তাই চুপ করেই বসেছিলাম, আর ভাবছিলাম এই বিরাটপ্লেন ও এতগুলি যাত্রীর কথা। এ দেশে এই সব প্লেন কত দিন থেকে চলছে জানিনে। আমাদের দেশে এই প্লেন চলার ইতিহাস

মাত্র বছর পঞ্চাশের। কোথায় যেন শুনেছি, ভারতবর্ষের প্রথম প্লেন উড়েছিল ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর। ভারত তখন অখণ্ড ছিল। করাচীর ড্রিগরোড থেকে বম্বের জুহুতে এসে নেমেছিল সেই প্লেন। তার পাইলট ছিলেন জে. আর. ডি. টাটা। তারপর আমাদের দেশেও এসেছে নানা জাতের প্লেন—ফক্স মথ, লেপার্ড মথ, মাইলস্ মার্লিন, ডি হ্যাভিল্যাণ্ড, র‍্যাপিডস, বীচ ক্র্যাফ্ট প্রভৃতি নানা নামের প্লেন। তারপর ড্যাকোটা এলো, ভাইকার্স ভাইকিংস, কন্স্টেলেশন জেট ও বোয়িং। আজকের এই বোয়িং ৭৪৭ পৃথিবীর বৃহত্তম যাত্রীবাহী প্লেন। কিন্তু কতদিন এর এই সম্মান থাকবে জানিনে।

এই সব কথা ভাবতে ভাবতেই মাটি ছেড়ে আমরা আকাশে উঠে পড়েছিলাম। বিলেতের আকাশ। কয়েকটি মুহূর্ত পরেই আমরা অতলান্তিকের আকাশে। সূর্য এখন আমাদের মাথার উপরে। যখন আমেরিকায় পৌঁছব, তখনও সূর্য আমাদের মাথার উপরে থাকবে। তার মানে সূর্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমরা ছুটবো। আর একটু জোরে ছুটতে পারলে সূর্যকে আমরা হারিয়ে দিতে পারতাম।

না, একটু ভুল হলো কথায়। সূর্য ছুটছে না। পৃথিবী ঘুরছে পশ্চিম থেকে পূর্বে। আমরা উড়ে যাব পূর্ব থেকে পশ্চিমে। পৃথিবী যত বেগে পূর্ব দিকে ছুটছে, আমরা প্রায় তত বেগেই পশ্চিমে ছুটবো। তার মানে সূর্যের কাছ থেকে দূরত্ব আমাদের কমবেও না, বাড়বেও না। আমরা যেন আকাশে স্থির হয়ে আছি। সূর্যের মতো স্থির। হাতের ঘড়ি আমাদের পিছিয়ে দিতে হবে আমেরিকার মাটিতে নেমে।

কতক্ষণ আমি নিঃশব্দে বসেছিলাম জানিনে। আমার পাশের ভদ্রলোক যে কতক্ষণ আমাকে লক্ষ্য করেছিলেন, তাও বুঝতে পারি নি। হঠাৎ তার দিকে চোখ পড়তেই তিনি বললেন : আপনি খুব দুর্ভাবনায় পড়েছেন বলে মনে হচ্ছে!

বললাম : দুর্ভাবনায়! তা কেন পড়ব!

ভদ্রলোক বললেন : কোনো দিকে না তাকিয়ে আপন মনে কিছু ভাবছেন

দেখছি।

বললাম : অনেক এলোমেলো কথা।

ভদ্রলোক হেসে নিজের পরিচয় দিলেন ; বিল ক্রফোর্ড।

আমিও নিজের নাম বললাম। কিন্তু ইংরেজদের মতো হাত বাড়িয়ে দিলাম না।

বিল বললেন : আপনি কি স্টেট্‌সে প্রথম যাচ্ছেন ?

বললাম : হ্যাঁ।

এর পরেও কিছু শোনবার জন্য ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন দেখে নিজের ব্যাপারটা তাঁকে খুলেই বললাম।

ভদ্রলোক খুশী হয়ে বললেন : খুব ভালো কথা। এই সুযোগে আমাদের দেশটা ভালো করে দেখে নেবেন। ভালো মন্দ সব কিছু।

ভদ্রতার খাতিরে আমি বললাম : মন্দ আবার কী আছে ?

আছে বৈকি। বলে বিল নিঃশব্দে রইলেন।

আমার মনে হলো যে একজন বিদেশীর কাছে বিল এর চেয়ে বেশি কিছু বলবেন না। নিজের দেশের নিন্দা করতে তাঁর দ্বিধা হচ্ছে। এটাই স্বাভাবিক। আমাদের দেশের বিদ্বানরা বিদেশে গিয়ে স্বদেশের নিন্দা করেন কেমন করে, সেটাই আশ্চর্যের। আমি তাই আমেরিকার মন্দ দিকটা জানবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলাম না।

আমরা তখন অতলান্তিক মহাসাগরের উপর দিয়ে যাচ্ছি। চারিদিকে উপরে ও নিচে জল আর আকাশ ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। অদ্ভুত অকল্পনীয় দৃশ্য। এমনি করে আকাশ পথে উড়ে আমরা একটা মহাসাগর পার হয়ে যাব কয়েক ঘণ্টায়। একথা ভাবলেই যেন রোমাঞ্চ হয়। মনে পড়ে মহাকাশ যাত্রার কথা। পৃথিবীর আকাশ থেকে চাঁদের আকাশে যাবার কথা, কিংবা মঙ্গলগ্রহের আকাশে। আমরা উড়তে শিখেছি। নিজেদের আকাশে উড়ে আর আনন্দ পাই না। তাই গ্রহান্তরের আকাশে উড়ে যাবার চেষ্টায় মেতে আছি। আর যে দেশ এখন সবচেয়ে বেশি মেতে আছে এই কাজে, সেই দেশটাই আমি দেখতে যাচ্ছি।

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকবার পরে বিল আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন: স্টেট্‌সে আপনি কী কী দেখবেন ঠিক করেছেন?

বললাম: আপনাদের সঙ্গে কথা বলেই তা ঠিক করবো ভেবেছি

আমাদের সঙ্গে কথা বলে!

ঠিক তাই।

তারপরে বুঝিয়ে বললাম যে আমেরিকা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা খুবই সীমাবদ্ধ। কয়েকটি বড় বড় শহরের নাম জানি। যেমন ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক, শিকাগো, বোস্টন, সানফ্রান্সিস্কো ইত্যাদি। কয়েকটি শৌখিন জায়গারও নাম শুনেছি। যেমন মায়ামি, লস এঞ্জেলস, হলিউড, ডিজ্‌নি-ল্যাণ্ড। নায়গ্রা জলপ্রপাত ও পরম আশ্চর্য পার্বত্য এলাকা গ্র্যাণ্ড কেনিয়ানের নামও জানা আছে। কিন্তু এই নিয়েই তো আমেরিকা নয়। আমি তাই সত্যি কথাই বিলকে বললাম: আপনাদের দেশে এলে কী দেখা উচিত, সেটা বোধহয় আপনারাই ভালো বলবেন।

কেন এরকম ভাবছেন বলুন তো?

বলে বিল আমার দিকে ফিরে তাকালেন।

বললাম: আমি যদি আপনাকে ভারতবর্ষে এসে দিল্লী কলকাতা বম্বে ম্যাড্রাস দেখে ফিরে যেতে বলি, কিংবা আগ্রার তাজমহল আর বেনারসের মন্দির, তাহলে সত্যিকার ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আপনার কিছুই জানা হবে না। ভারতবর্ষকে চিনতে হলে আপনাকে শহরের বাইরে যেতে হবে, মিশতে হবে সাধারণ মানুষের সঙ্গে।

বিল বললেন: এ খুব কঠিন কাজ। বিদেশে দিন কয়েক কাটিয়ে সে দেশ বা দেশের মানুষ চিনে নেওয়া বোধহয় সম্ভবই নয়। বরং ছোট বড় কয়েকটি শহর দেখে মোটামুটি একটা ধারণা করা চলতে পারে।

এ একটা তর্কের বিষয়। তর্ক বাড়াবার ইচ্ছা ছিল না বলে আমি চুপ করে গেলাম। কিন্তু এতক্ষণ কথা হবার পরেও জ্যাক হক্স্‌ওয়ার্থের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথাটা জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না।

বিল কিন্তু থামলেন না, বললেন: আপনি যদি কিছু ঠিক করে না থাকেন

তো আমি আপনাকে একটা পরামর্শ দিতে পারি।

বললাম : খুব ভালো।

বিল বললেন : প্রথমে আপনাকে ঠিক করতে হবে, আমেরিকা কী ভাবে দেখবেন। মানে কি রকমের যানবাহনে। যদি সময় খুব কম থাকে, তবে প্লেনেই দেখতে হবে। তাতে কোনো অসুবিধে নেই। এ দেশে ন হাজার এয়ারপোর্ট আছে, আর এয়ার লাইন্স কোম্পানি আছে বিরানব্বুইটি।

সর্বনাশ! আমাদের দেশে হয়তো এত শহরই নেই!

তাইতেই তো বলছিলাম যে আপনি যে-কোনো জায়গায় প্লেনেই যেতে পারবেন। কিন্তু এত শহর আপনার দেখবার দরকার নেই। তবে একটা ভালো ব্যবস্থা করে এদেশে আসতে পারতেন।

কী ব্যবস্থা?

প্যান অ্যামেরিকান এয়ারওয়েজের একটা এক্স্‌ট্রা সিটিজ্‌ বোনাস প্ল্যানে লণ্ডন থেকে লস এঞ্জেল্‌স রাউণ্ড ট্রিপ টিকিট কাটতে পারতেন। তাতে কোনো অতিরিক্ত চার্জ না দিয়েই কুড়িটা শহরে নামা চলতো।

বললাম : খুব ভালো প্ল্যান। কিন্তু সে রকম টিকিট না কাটবার জন্যে আমার কোনো দুঃখ হচ্ছে না।

কেন?

কুড়িটা শহরের নাম আমার জানা নেই।

বিল আশ্চর্য হলেন আমার কথা শুনে, কিন্তু কোনো উত্তর দিলেন না। আমার মনে হলো যে ভদ্রলোক বোধহয় মনে আঘাত পেয়েছেন। তাই বললাম : হঠাৎ কিছু করে বসলে পরে পস্তাতে হয়। তাই ঠিক করেছি যে একটা প্রাথমিক ধারণা হবার পরে সব ঠিক করবো।

সে খুব ভালো কথা। তা ছাড়া এ দেশের রেলগাড়িও মন্দ নয়, আর নানা-রকম কন্‌সেশন দেয় বিদেশীদের। যে-কোনো জায়গা থেকে যে-কোনো জায়গায় যেতে চাইলে মোট ফেয়ারের পনেরো পার্সেন্ট পর্যন্ত বাদ দেয়। আরও নানা রকম সুবিধা আছে—স্পেশ্যাল ফ্যামিলি ফেয়ার, গ্রুপ ইকনমি ফেয়ার, পার্টি এক্স্‌কার্সন রেট, যেমনটি চাই। অল-এক্স্‌পেন্স

[কর্টেড ট্যুরও আছে। তাতে আপনার কোনো খরচ লাগবে না। রেলের
কটের সঙ্গে হোটেল খরচ, নতুন জায়গায় ঘুরে দেখবার খরচও ধরা
কে।
লাম : সব দেশে বোধহয় এ রকম ব্যবস্থা নেই।
ল বললেন : আমেরিকায় রেলরোড তো সরকারী ব্যবস্থা নয়, তাই
নেক লাইনেই এই সব ব্যবস্থা আছে।
ল এর পরে একটু সময় নেবার জন্য থেমেছিলেন। আমি ভাবলাম, এই
যোগ। এইবারে এদের সামাজিক প্রসঙ্গ তুলে হক্স্‌ওয়ার্থের কথা জেনে
ওয়া যাক। কিন্তু কী বলবো, ভেবে পাবার আগেই বিল বললেন : যে
বেই বেড়ান, একবার আপনাকে বাসে উঠতে বলবো গ্রে হাউণ্ড্‌ বাস
ইনে। সত্যি বলতে কি, বাসে বেড়াবার এমন সুব্যবস্থা আমি আর
কানো দেশে দেখি নি।
মার ভাবনা কেমন এলোমেলো হয়ে গেল। আর ভদ্রলোক বললেন :
দের একটা প্ল্যান আছে—নিরানব্বুই ডলার ভাড়া দিয়ে নিরানব্বুই
ন যেখানে খুশি বেড়াবার। তার মানে দিনে এক ডলার খরচ। গরম
লে এয়ার কণ্ডিসণ্ড্‌ বাস, শীতকালে হীটেড। বাসের মধ্যেই রেস্ট রুম
াছে, স্ন্যাক বার আছে। অনেক কোম্পানি আছে, যারা রেল রোডের
তো হোটেল খরচও বহন করে।
রপর একটু ভেবে আবার বললেন : আমি একটা তের দিনের ট্রিপের
থা বলতে পারি। নিউইয়র্ক সিটি থেকে ওয়াশিংটন ডি. সি., তারপর
 গ্রা ফল্‌স হয়ে ক্যানাডা। সব খরচ বাস কোম্পানির। আপনাকে
তে হবে—
লে টাকার অঙ্কটা মনে করার চেষ্টা করে বললেন : দেড়শো ডলারের কিছু
ম।
আমেরিকার যানবাহনের কথা অনেক শুনেছি। এবারে চট্‌ করে জিজ্ঞাসা
করে বসলাম : লণ্ডনে আপনি কি কোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে নেমে-
ছিলেন ?

যেন আমি তাঁকে আগে দেখতেই পাই নি। এমনি ভাবে তাঁর মুখের দিে
তাকালাম। বিলও যে আমাকে দেখতে পান নি, তা তাঁর উত্তর শুনে
বুঝতে পারলাম। সসঙ্কোচে তিনি বললেন : লণ্ডনে নয়, লীড্‌সে আমা
এক বন্ধু আছে। এয়ারপোর্ট থেকে আমাকে নিয়ে যেতে এসেছিল। আ
পৌঁছে দিয়ে গেল।

সত্যি!

বিল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন : পেগি। হক্স্‌ওয়ার্থ নামের একট
টাকার কুমীরের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে।

আমি কি এই রকমেরই কিছু সন্দেহ করেছিলাম! কিন্তু এর পরে ক
জানতে চাইবো তা ভেবে পেলাম না। যদি পারতাম তবে আমেরিকা
সামাজিক জীবনের একটা দিক আমার জানা হয়ে যেত।

কিন্তু না জানতে পারলেও আমার মন স্থির হচ্ছে না। অবৈধ প্রেমে
কথা জানবার আকর্ষণই এখন বেশি মনে হচ্ছে। কিন্তু তার সুযোগ পাওয়
গেল না। এয়ার হস্টেস কাছে এসে গেছে। যাত্রীদের এখন কিছু খেে
দেওয়া হচ্ছে।

৪

সামান্য একটুখানি আহারের পর বিল কতকটা চিৎ হয়ে শুয়ে চোখ
বুজলেন। বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছিল তাঁকে। এ তাঁর শারীরিক ক্লান্তি ন
মানসিক, তা বুঝতে পারলাম না। মানসিকও হতে পাবে। তার কারণ
একটু আগেও আমি তাঁর কথাবার্তায় কোনো ক্লান্তির লক্ষণ দেখি নি
তাই হঠাৎ এমনি বসে বসেই ক্লান্ত হয়ে পড়লেন, এ কথা বিশ্বাস করতে
কষ্ট হচ্ছিলো।

কিন্তু তিনি যখন চোখ বুজে আছেন, তখন আর কোনো উপায়ই নেই।
কোনো প্রশ্ন করা চলে না। যতক্ষণ চোখ না খুলছেন, ততক্ষণ আমাকে
অপেক্ষা করতেই হবে।

যাত্রীরা প্রায় সবাই এখন বিশ্রাম করছেন। দু একজন কোনো বই বা সাময়িক পত্রের পাতা ওল্টাচ্ছেন নিঃশব্দে। পিছন থেকে দু একটা কথা-বার্তারও শব্দ পাচ্ছি। আমি কী করবো ভেবে পাচ্ছি না।

আমার মনে একটা অস্থিরতার সঞ্চার হয়েছে। একেবারে নতুন দেশে গিয়ে নামবো। কোথায় উঠবো, কী করবো, কিছুই স্থির করতে পারছি না। এ আমার প্রথম আমেরিকা ভ্রমণ বলেই বোধহয় বেশি দুশ্চিন্তা হচ্ছে। মনে হচ্ছে যে প্রথম যাত্রায় একজন সঙ্গীর খুব প্রয়োজন। আর সেই সঙ্গী যদি গাইডের মতো হয়, তাহলে একেবারেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

বিলকে পাশে পেয়ে আমি এইজন্যে খুশী হয়েছিলাম। মোটামুটি কিছু খবর আমি এঁর কাছেই পাব ভেবেছিলাম। কিন্তু ভদ্রলোক অসময়ে চোখ বুজেই আমাকে বিপদে ফেললেন। পেগির কথাও জিজ্ঞাসা করতে পাচ্ছি না। পারছি না আমেরিকার সম্বন্ধেও কোনো খবর নিতে। মুখ ফিরিয়ে বিলকে আমি আর একবার দেখলাম। না, ভদ্রলোক ঘুমোন নি জেগেই আছেন মনে হচ্ছে। তবে কি তিনি তাঁর হারানো অতীতেরই সুখস্বপ্ন দেখছেন!

কিন্তু আমি কোনো স্বপ্ন দেখতে পাচ্ছি না। ঘুমও আসছে না চোখে আমার সঙ্গে কোনো পত্র পত্রিকাও নেই যে আমি তার পাতায় চোখ বুলোতে পারি। হঠাৎ আমার একখানি ছোট বই-এর কথা মনে পড়ে গেল। আমেরিকার উপরে একটি ছোট পুস্তিকা। কলকাতায় এটি আমি সংগ্রহ করেছিলাম। আমার ব্যাগের মধ্যেই পুস্তিকাটি আছে। এ কথা মনে পড়তেই আমি ব্যাগ খুলে সেটি বার করে নিলাম। ছোট ছোট অক্ষরের একটি পাতলা বই, কয়েকটি ছবিও আছে। আমেরিকার সম্বন্ধে কিছু খবর পাওয়া যাবে এই বই-এ।

কিন্তু পড়তে আরম্ভ করে দেখলাম যে খুবই নিরস বই। পড়বার কোনো আগ্রহ জাগে না। আমাদের দেশের সরকারী পুস্তিকার মতোই নিরস ছবিগুলি মনোযোগ দিয়ে দেখলাম। আর বই-এর শেষের দিকে দেখলাম কিছু ইতিহাসের কথা।

সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো এই যে আমেরিকার কোনো প্রাচীন ইতিহাস নেই। এ দেশের আদিম অধিবাসীদের সম্বন্ধে কোনো কথাই এতে লেখা নেই। আমেরিকা নামের এই বিরাট দেশটার নাম জানতো কিনা, তাও কেউ বলতে পারে না। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষদিকে ক্রিস্টোফার কলম্বাস ভারতবর্ষ আবিষ্কারে বেরিয়ে আমেরিকার মাটিতে প্রথম নেমে-ছিলেন। সেই দিনটি ছিল ১৪৯২ খ্রীস্টাব্দের ১২ই অক্টোবর। কিন্তু আমি যে আমেরিকায় যাচ্ছি, কলম্বাস সে আমেরিকায় পৌঁছন নি। তিনি নেমে-ছিলেন উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যবর্তী সংকীর্ণ-ভূখণ্ডের একটি ছোট দেশ সান সাল্‌ভাডরে। এর পরেও অনেকদিন কিছু জানা যায় না। বলতে গেলে আমেরিকার ইতিহাসের আরম্ভ হয় সপ্তদশ শতাব্দী থেকে। ইউরোপের মানুষ যেদিন থেকে আমেরিকায় গিয়ে বসতি স্থাপন করলো, সেইদিন থেকেই তার ইতিহাসের আরম্ভ।

১৬০৭ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজরা এসে ভার্জিনিয়ার জেম্‌স টাউনে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। তার তেরো বছর পরে মে-ফ্লাওয়ার জাহাজে একদল গোঁড়া পিউরিটান ধর্ম বিরোধের জন্য আমেরিকায় চলে এলো। তারপরে তারা দলে দলে আসতে লাগলো। দেখতে দেখতে দশটি ইংরেজ উপনিবেশ ও তিনটি ডাচ উপনিবেশ গড়ে উঠলো। এই সব উপনিবেশ কেমন করে ইংরেজের দখলে এলো, কেমন করে তারা ইংলণ্ডের শাসন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলো, তাই নিয়েই আমেরিকার ইতিহাস। এই ইতিহাসের সঙ্গে কানাডার কথাও জড়িয়ে আছে। সেখানে ফরাসীরাই বেশি এসেছিল। তবু একদিন ইংরেজ তা দখল করলো। আর ফরাসীরাই সাহায্য করলো আমেরিকার ইংরেজদের স্বাধীনতার যুদ্ধে।

আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের আমরা আমেরিকান বলি না। কলম্বাস আমেরিকায় পৌঁছে তাকে ইণ্ডিয়া ভেবেছিলেন বলে সেই আদিম অধি-বাসীরা এখনও ইণ্ডিয়ান নামে পরিচিত। আমরা রেড ইণ্ডিয়ান বলি। আমেরিকান বলতে আমরা আমেরিকাবাসী ইংরেজ ও অন্যান্য ইউরোপীয়-দেরই বুঝি। ১৭৭৬ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা জুলাই তারা তাদের স্বাধীনতা ঘোষণা

করেছিল। ইংরেজ সেনা আত্মসমর্পণ করেছিল পাঁচ বছর পরে। স্বাধীনতার যুদ্ধে আমেরিকান সেনানায়ক ছিলেন জর্জ ওয়াশিংটন নামে এক জমিদার। ১৭৮৯ সালে তিনিই আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট হন।
এই প্রেসিডেন্টের নামেই রাজধানী হয়েছে ওয়াশিংটন। ওয়াশিংটন ডি.সি.। ডি. সি. মানে ডিস্ট্রিক্ট অফ কলাম্বিয়া। আমেরিকার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ওয়াশিংটন নামে একটি স্টেট আছে বলেই রাজধানীকে বলা হয় ওয়াশিংটন ডি. সি.। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম বছর ১লা ডিসেম্বর ফিলাডেলফিয়া থেকে রাজধানী এখানে স্থানান্তরিত করা হয়।
আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জন কেনেডির মর্মান্তিক মৃত্যুর কথা আমরা কাগজে পড়েছি। এই ঘটনা ঘটেছিল ১৯৬৩ সালের ২২শে নভেম্বর। প্রায় একশো বছর আগে আর একজন প্রেসিডেন্ট ঠিক এমনি ভাবেই তাঁর প্রাণ হারিয়েছিলেন। ১৮৬৫ সালের ১৪ই এপ্রিল প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কনকেও গুলি করে হত্যা করেছিল আমেরিকাবাসী। দেশের সিভিল ওয়ার শেষ হবার পরে চুয়ান্ন বছর বয়সের প্রেসিডেন্ট সেদিন নিশ্চিন্ত মনে থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলেন।
লিঙ্কনের মতো জনপ্রিয় প্রেসিডেন্টকে কেন প্রাণ দিতে হয়েছিল, সে কথা ভাবতে গেলে ইতিহাসের কথাই মনে পড়ে। যীশুখ্রীস্ট বা গান্ধী কেন প্রাণ দিয়েছিলেন? জন কেনেডি কী দোষ করেছিলেন? চাষীর ছেলে লিঙ্কন প্রথমে ছুতোর মিস্ত্রীর কাজ করতেন। তারপর বন্ধুর সঙ্গে বখ্‌রায় দোকান করে লোকসান দিলেন। শেষ পর্যন্ত আইন পাশ করে উকিল হলেন। সৎ, সত্যবাদী ও দৃঢ় চরিত্রের মানুষ বলে তাঁর খ্যাতি ছিল। যে অন্যায় করেছে, তার পক্ষ নিয়ে কখনও মামলা করতেন না। পরে অন্যায় ধরা পড়লেও হাতের মামলা ছেড়ে দিতেন। দাসপ্রথার বিরুদ্ধে ছিল তাঁর প্রবল ঘৃণা। আর এই দাসপ্রথা খুব প্রিয় ছিল দক্ষিণ অঞ্চলের আমেরিকানদের। তাই লিঙ্কন প্রেসিডেন্ট হতেই তারা ভয় পেল যে এইবারে হয়তো দাসপ্রথা উঠে যাবে সরকারী আইনে। তাই তারা বিদ্রোহ করলো। এই বিদ্রোহই আমেরিকার গৃহযুদ্ধ। কঠিন হাতে লিঙ্কন সেই বিদ্রোহ দমন

করলেন। কিন্তু নিজের প্রাণ রক্ষা করতে পারলেন না।

সাদা-কালোর বৈষম্য আমেরিকায় আজও পুরোপুরি লোপ পায় নি। লিঙ্কনের একশো বছর পরেও কেনেডি প্রাণ দিলেন। এই বৈষম্য দূর হতে আরও কত কাল সময় লাগবে তা কে জানে!

শুনেছি, আরও চারজন প্রেসিডেণ্টের উপরেও হামলা হয়েছিল। আরও কত জনের জীবনও বিপন্ন হবে তা কে জানে!

ইতিহাসের কথা পড়তে পড়তেই আমার একটু ঝিমুনি এসেছিল। পড়া তো নয়, একটুখানি ঘটনা অবলম্বন করে মন তার নিজের কাজ করে যাচ্ছিলো। আমার গায়ের রঙও কালো। ভারতবর্ষের হিসাবে না হলেও যে দেশে যাচ্ছি সে দেশের মাপকাঠিতে আমরা সবাই কালো। শুনেছি, বিলেতে নাকি রবীন্দ্রনাথের মতো ফর্সা সুপুরুষকেও লালমুখো ইংরেজ ব্ল্যাকি বলতে দ্বিধা করে নি। কালোর প্রতি বিদ্বেষ ছিল ইংরেজের। দক্ষিণাংশের আমেরিকানদেরও ছিল। এখন এই বিদ্বেষ কতখানি অবশিষ্ট আছে, তা আমার জানা নেই।

বিলকে হঠাৎ নড়ে চড়ে বসতে দেখলাম। না, তিনি ঘুমোচ্ছিলেন না। এতক্ষণ জেগেই ছিলেন। হয়তো ভাবছিলেন কিছু। হয়তো বা তিনিও তাঁর অতীতের মধ্যে ডুবে ছিলেন, কিংবা খেলা করছিলেন কোনো স্মৃতি নিয়ে। কিন্তু আমি তাঁর সঙ্গে কোনো কথা বলবার সাহস পেলাম না। আমি তাঁরই কথা শোনবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

এয়ারপোর্টের সেই মহিলার নাম আমার মনে পড়লো। পেগি হক্স্‌ওয়ার্থ। টাকার কুমীর জ্যাক হক্স্‌ওয়ার্থকে বিয়ে করেছেন তিনি। তার আগে বিলেরই বন্ধু ছিলেন। এ কী রকমের বন্ধু জানিনে। আমাদের দেশেও আজকাল বন্ধু কথাটা চলতে শুরু হয়েছে। ছেলের ছেলে বন্ধু আর মেয়ের মেয়ে বন্ধু নয়, এ ছেলেমেয়ের বন্ধুতা। ছেলের গার্ল ফ্রেণ্ড, আর মেয়ের বয়-ফ্রেণ্ড। আমেরিকা থেকেই বোধহয় এই শব্দের আমদানি হয়েছে। স্কুল-কলেজে কো-এডুকেশন অনেকদিন থেকেই চলছে। আগে ছেলেমেয়েরা দূরে দূরে থাকতো, এখন আর সে রকম কোনো বিধি-নিষেধ নেই। বেশ

সহজভাবেই একসঙ্গে লেখাপড়া করে, বন্ধুতা হয়। অনেক সময় বিয়েও হয়। কিন্তু বয়ফ্রেণ্ড বা গার্লফ্রেণ্ড শব্দ ঠিক এদের নিয়ে ব্যবহার হয় না। শুনেছি, আমেরিকায় এই সব শব্দের ব্যবহার একটা বিশেষ অর্থে। সব ছেলেই একটা মেয়ের বয়ফ্রেণ্ড নয়, আবার সব মেয়েই একটা ছেলের গার্ল-ফ্রেণ্ড নয়। ছেলেরা একটি মেয়েকে, বা মেয়েরা একটি ছেলেকে বিশেষ বন্ধু হিসেবে বেছে নেয়। আর সে কথাটা লুকানো থাকে না। সবাই জানে। আর এই সম্বন্ধ যে সব সময় পাকা হয়, তাও না। অনেক সময়েই বিচ্ছেদ হয়ে যায়। তারপরে শুরু হয় নতুন খেলা। যতদিন বিয়ে না হচ্ছে, ততদিন এই ভালবাসাবাসির খেলা চলতে থাকে।

আমি যে জেগে আছি, সে কথা বোঝাবার জন্যেই একটু শব্দ করে ব্যাগের মধ্যে আমার বইখানা পুরে ফেললাম। আমার এই শব্দে বিল চোখ মেলে তাকালেন। বইএর নামটাও বোধহয় পড়তে পেরেছিলেন। তাই আমার দিকে ফিরে যখন নিশ্চিন্ত হলেন যে আমি সময় কাটাবার সমস্যায় পড়েছি, তখন বললেন : আমেরিকার সম্বন্ধে আপনার কৌতূহল বুঝি খুব বেশি !

খুশী হয়ে বললাম : খুব স্বাভাবিক কারণেই !

বিল আমার কথা পুরোপুরি বুঝতে না পেরে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

বললাম : আপনাদের দেশ দেখবার একটা অপ্রত্যাশিত সুযোগ পেয়েছি। এ রকম সুযোগ জীবনে বোধহয় দ্বিতীয়বার আসবে না। অথচ এত অল্প দিন আপনাদের দেশে থাকবো যে এই সময়ে আমেরিকার বাইরেটা দেখতে পেলেও ভেতরের কিছু দেখবার বা জানবার সময় পাবো না, সুযোগও না। আপনাদের সমাজটা চেনবার আগ্রহই আমার বেশি ছিল। তার কারণ ছেলেমেয়েদের মেলামেশার স্বাধীনতা আমরা এখনও ভালো করে দেখি নি।

বিল এক মুহূর্ত ভাবলেন. তারপর বললেন : একটা উদাহরণ দিলেই আপনি বোধহয় বুঝতে পারবেন।

খুব পারবো।

বলে আমি সাগ্রহে তাঁর মুখের দিকে তাকালাম।
ভদ্রলোক নীরব হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। মনে হলো যে কিভাবে গল্পটা বলবেন, তাই বোধহয় ভাবছেন। শেষ পর্যন্ত বিল বললেন : ইউরোপের দু একটা দেশ যতটা এগিয়েছে, আমরা এখনও তত এগোতে পারি নি। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা খুব ছোট থেকেই স্বাধীন ভাবে মেলামেশা করে বটে, কিন্তু চোখের সামনে বেহায়াপনা করে না। ছেলেমেয়েদের জন্যে পথেঘাটে দোকান খুলে রাতারাতি তাদের পাকিয়ে দেবার ব্যবস্থাও নেই।
আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম : অন্য দেশে কি সে রকমের ব্যবস্থা আছে?
আছে বৈকি।
বিল এবার একটু রহস্যময় ভাবে বললেন : ইউরোপ হয়ে যদি ফেরেন, তো সেই সব দোকান দেখে যাবেন। দোকানে ঢুকে লজ্জা করবে আপনার। হয়তো কোনো মেয়েই আপনাকে সব বোঝাতে শুরু করবে। ভারতবর্ষ তো এ সব ব্যাপারে একটু গোঁড়া বলে শুনেছি। আপনি হয়তো চোখ মেলে চাইতেই পারবেন না। তারপর ছেলেমেয়েরা শুনেছি বিয়ের আগেই একত্রে বসবাস শুরু করে। কিছুদিন স্বামী-স্ত্রীর মতো থাকবার পরে বিয়ে করবে কিনা ঠিক করে। বিয়ে হয়ে গেল তো ভালো, না হলে আর এক-জনের সঙ্গে আবার কিছুদিন সংসার করা। এতে কারও কিছু বলবার নেই। ভাবতে পারেন এই স্বাধীনতার কথা?
পারি।
পারেন?
ভদ্রলোক চমকে উঠে আমার দিকে ফিরে তাকালেন।
আমি হেসে বললাম : আমাদের দেশেও এই রকমের কিছু সমাজ ব্যবস্থা আছে।
না না, এ রকম তামাসা করবেন না!
বলে ভদ্রলোক কাতর চোখে আমার দিকে তাকালেন।
বললাম : তামাসা করছি না। আমি সত্যি কথাই বলছি। তবে এ

আমাদের সভ্য সমাজের কথা নয়। এ হলো একটা আদিবাসী সমাজের কথা। কোন্ রাজ্যের কী সমাজ তা মনে নেই। তবে তারা বন্য সমাজ বলেই চিহ্নিত। বনের বাইরে এ রকম সমাজের কথা আমরা শুনি নি।

বিল আশ্বস্ত হয়ে বললেন : তাই বলুন। আপনার কথা শুনে আমি রীতি-মতো ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।

তারপরে বললেন : ছেলেমেয়েদের মধ্যে এক আধটু গোলমাল থাকবেই। এটা স্বাস্থ্যেরই লক্ষণ। তাই বলে—

বললাম : বুঝেছি।

বিল বললেন : হিমালয়ের সাধু-সন্ন্যাসীদের কথা আমি বলছি না। আমি শহরের ছেলেমেয়েদের কথা বলছি। কাজেই এ বিষয়ে আপনার আমার দেশে যে খুব বেশি তফাৎ আছে, তা মনে হয় না। তফাৎটা হলো, কোন্ দেশে কতটা প্রকাশ্য ভাবে হয়, তাই নিয়ে। আপনাদের দেশে হয়তো পুরোপুরি গোপনে হয়, আমাদের দেশে অনেকটাই খোলাখুলি ভাবে। মানে—

বলে বিল একটুখানি থামলেন, ভাবলেন একটুখানি। তারপরে বললেন : অস্বীকার করবো না, অনেক ক্ষেত্রে আমাদেরও আজকাল দৃষ্টিকটু লাগছে।

আমি কোনো কৌতূহল প্রকাশ করলাম না।

বিল নিজেই বললেন : অনেক জায়গায় দেখছি যে মেয়েরা তেরো-চোদ্দ বছর বয়সে পড়তে না পড়তেই বয় ফ্রেণ্ড খুঁজতে শুরু করে। ছেলেরাও তেমনি হয়েছে। একটা গার্ল ফ্রেণ্ড না থাকলে যেন মান সম্মান আর থাকে না, এমনি ভাব। 'ডেটিং' জিনিষটা এমন প্রচলিত হয়েছে যে উইক-এণ্ডে ডেট না থাকাটা একটা অসম্মানের ব্যাপার। ডেটিং বলতে ছেলেমেয়েরা অজ্ঞান।

এই ডেটিং সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা আমার ছিল। টেলিফোনে কিংবা সামনাসামনি একটা সময় ঠিক করে একটি ছেলে কোনো একটি বিশেষ মেয়েকে ডাকবে কোনো বিশেষ জায়গায়। একটু ভালবাসাবাসির খেলা। এ ব্যাপারে কী করতে হয়, মায়েরা নাকি মেয়েদের আজকাল শিখিয়ে

দিচ্ছে। মেয়েরা ডেট না পেলে মায়েরাই উদ্বিগ্ন হচ্ছে বেশি।

এ সব কথা সত্যি না মিথ্যে, তা জানিনে। বিলকে জিজ্ঞাসা করতেও আমার লজ্জা হলো। তাদের দেশে যখন যাচ্ছি, আর থাকবোও যখন কিছু দিন, তখন সত্য ঘটনা জানতে বোধহয় অসুবিধা হবে না। তার জন্য কৌতূহল প্রকাশ করা অশোভন হবে ভেবে আমি নীরব রইলাম।

বিলও আমাকে এই কথাই বললেন : নিজের চোখেই আপনি অনেক কিছু দেখতে পারেন।

আমি এ কথারও কোনো উত্তর দিলাম না।

বিল বললেন : পেগির সঙ্গে আমার ছোটবেলায় কোনো বন্ধুতা ছিল না। সত্যি কথা বলতে কি, আমি তাকে চিনতামও না।

বললাম : বুঝেছি। আপনাদের পরিচয় খুব অল্প দিনের।

বিল হেসে বললেন : কিছুই বোঝেন নি। অল্প দিনের পরিচয় হলে আমি তাকে বন্ধু বলবো কেন !

তাও তো বটে।

এ কথাও ঠিক নয়। খুব অল্প সময়েও মানুষ ঘনিষ্ঠ হতে পারে। আমাদের কথাই ধরুন না, পেগির সঙ্গে আমার পরিচয় আর কত দিনের বলুন !

একটু ভেবে বললেন : এই ধরুন, বছর তিন চারেকের মতো হবে, যেদিন তাকে প্রথম দেখেছিলাম, সে দিনটির কথা আমার পরিষ্কার মনে আছে। মায়ামির একটা হোটেলে আমি ছিলাম। মায়ামি জানেন ?

জায়গাটার নাম শুনেছি।

না শুনে থাকলেও দোষ দেবো না। তার কারণ পঞ্চাশ বছর আগে বোধ-হয় এ জায়গাটার অস্তিত্ব ছিল না। ভূগোলের বই-এ এ জায়গাটির নাম আপনি দেখেন নি। কিন্তু এখন যে ভূগোল লেখা হচ্ছে, তাতে দেখবেন যে এর চেয়ে শৌখিন জায়গা এ দেশে কম আছে। মানে বিদেশ থেকে এলে মায়ামি আপনাকে দেখে যেতেই হবে। এই নামটা আপনি আপনার নোট বুকে টুকে নিন।

বললাম : মনে রাখবো।

বিল বললেন : মেক্সিকো উপসাগরের তীরে ফ্লোরিডা স্টেট্ হলো সবচেয়ে দক্ষিণ-পূর্বে। রোদে আর টাকায় ঝকঝক করছে এই নতুন শহর। আমি কী একটা কাজে গিয়েছিলাম সেখানে। পরের টাকায়। তাই একটা শৌখিন হোটেলেই ছিলাম। একদিন সকাল বেলায় লাউঞ্জে দেখা হয়ে গেল পেগির সঙ্গে।

তারপরেই বললেন : ভুল করবেন না, প্রথম দিন তার নাম পেগি ছিল না। একটা টেকো মাথা টাকার কুমীরের সঙ্গে সে এসেছিল। তার পাশে সেই লোকটাকে দেখেই আমি এই কথা বুঝতে পেরেছিলাম। ভেবেছিলাম যে পেগি নিশ্চয়ই তার বিয়ে করা বউ নয়। তা হলে—

এই কথা বলে বিল থামলেন।

আর আমি বললাম : বুঝেছি।

না। বোঝেন নি।

বিল এবার প্রতিবাদ করলেন।

আর আমি চুপ করে রইলাম।

খানিকক্ষণ নীরবে থাকবার পরে বললেন : বুঝতে আমারই অনেক সময় লেগেছিল। মানে, দু'জনেই এমন কৌশলে কথাবার্তা বলছিল যে আমি অনেকক্ষণ কান পেতেও কোনো সন্দেহ করতে পারি নি। কেন সন্দেহ হলো, সে কথা আপনাকে বলতে পারবো না। যতটুকু বলছি, ততটুকুই জানুন।

আপত্তি করা আমার সাজে না, তাই চুপ করে রইলাম।

বিল বললেন, হোটেলে খবর নিয়ে জানলাম যে তারা মিস্টার ও মিসেস নাম লিখিয়েছেন। কিছু খরচ করে খবর পেলাম যে এর আগের সিজনে মিসেস অন্য মিস্টারের সঙ্গে এসেছিলেন। সে নামটা জেনে নিয়েই কোপ মারলাম। হাতে নাতে ধরা পড়ে গেল পেগি।

তারপরেই সহাস্যে বললেন : বুঝতে পারলেন কিছু ?

বললাম : না।

পেগি মডেল হতে চেয়েছিল। চেষ্টাও করেছিল খুব। কিন্তু ওপরে উঠতে পারে নি। ফিগারটা একটু ভারি, তার জন্যেই অসুবিধা হচ্ছিল। কিন্তু

চোখে পড়লো অনেকের। তারপর বুঝতেই পারছেন, দু'দিক থেকেই তখন পয়সা রোজগার করছিল।

একটু থেমে বললেন : ভেবেছিলাম, এই জীবন থেকে ওকে সরিয়ে আনবো। সেও রাজী হয়েছিল। আর এই নিয়েই ওর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা। আমার অ্যাপার্টমেণ্টে অনেক রাত ও কাটিয়েছে। বিয়েও হতো।

আমি খানিকটা কৌতূহল প্রকাশ করে ফেললাম : কেন হলো না ?

বিল খুব বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললেন : আমার কপাল খারাপ। তা না হলে বিয়ের ঠিক আগে ইংলণ্ড থেকে ঐ হক্স্‌ওয়ার্থ এসে ওকে কেড়ে নিয়ে যেত না।

সেকি ! পেগির নিজের কি কোনো মতামত নেই ?

না। ও ভেবেছিল যে পয়সাই সুখ। অন্তত হক্স্‌ওয়ার্থ নাকি ওকে তাই বুঝিয়েছিল। বলেছিল যে জীবনে প্রেম বলে কোনো বস্তু নেই, ওটা কবিদের কথা। কবিতা লেখার জন্যে ঐ শব্দটার দরকার, আর জীবনে দরকার পয়সার।

বলে বিল অনেকক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইলেন।

আমিও কোনো প্রতিবাদ করলাম না।

হঠাৎ বিল আমাকে আক্রমণ করে বললেন : আপনিও কি এই কথা মেনে নিলেন ?

আমি গম্ভীর ভাবেই বললাম : এ যুগের এও একটা মত। আমাদের দেশেও অনেকে বলছে যে বোকারাই প্রেমের কদর করে, জীবনটা উপভোগের জন্যে প্রেমের কোনো প্রয়োজন নেই।

কী বলছেন আপনি !

বলে বিল সোজা হয়ে বসলেন।

বললাম : ঠিকই বলছি। প্রেম কথাটা বোধহয় সব দেশেই সেকেলে হয়ে গেছে। হবেই। সততার অভাবের দিনে প্রেমের মধ্যেই বা সততা থাকবে কেন ! আর সততা না থাকলে তাকে আর যাই বলি, প্রেম বলতে পারি না।

বিল আমার দিকে কতকটা বিহ্বল চোখে তাকালেন। তারপর বললেন : এইজন্যেই ভারতীয়দের আমরা দার্শনিক বলি।

উত্তরে আমি হেসে বললাম : আমাদের কথা থাক। আপনি পেগির কথা বলুন।

পেগি কী বলে ?

বিল আবার সোজা হয়ে বসে বললেন : এখনও কি আমার পেগির কথা বিশ্বাস করা উচিত ?

বললাম : মিথ্যা বলার তো তার দরকার নেই !

বিল গম্ভীর ভাবে বললেন : আমিও তাই ভাবি। কিন্তু সে যা বলে, তা বিশ্বাস করার সাহস আমার নেই।

পেগি কী বলে সে কথা আমি জিজ্ঞাসা করলাম না। নিঃশব্দেই আমি তার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

বিল বললেন : সে নাকি এখনও আমাকে ভালবাসে।

আশ্চর্য নয়।

কেন ?

সে ঐ প্রেম কথাটার মাহাত্ম্য। এক সময় যদি সত্যিই সে আপনাকে ভালবেসে থাকে তো কিছু অবশিষ্ট থেকেই যাবে। কোনো দিন সেই ভাল-বাসা পুরোপুরি ফিরে আসতেও পারে।

বিলের মুখখানা ঠিক বোকার মতো দেখাল।

বললাম : আপনি টাকার কুমীর নন। আপনার কাছে ওর চাওয়ার মতো জিনিস একটিই আছে।

কী ?

আপনার ভালবাসা।

বিলের সমস্ত মুখখানা একরকমের প্রসন্নতায় ভরে গেল।

বললাম : আপনি যে আজও ওকে ভালবাসেন, সে কথা ও জানে।

আপনি জানলেন কী করে ?

বিল আমার মুখের দিকে তাকালেন।

বললাম : লণ্ডনে আপনি যখন তার দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন, তখনই আমি আপনার চোখের আলোয় তা দেখেছিলাম। বিল আশ্চর্য হয়ে বললেন : আপনি দেখেছিলেন আমাদের !

আমি এ কথার উত্তর দিলাম না। আর বিল নিঃশব্দে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আমার মনে হলো যে আমেরিকার সামাজিক জীবনের এও এক অদ্ভুত পরিচয় আমি পাচ্ছি। একটা মডেল মেয়েকে ভালবেসেছিলেন বিল। তার অতীত জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতার কথা জেনেও এগিয়ে গিয়েছিলেন এবং তার বিশ্বাসঘাতকতার পরেও হয়তো আগের মতোই ভালবাসছেন। এ কথা মনে হতেই আমার আর একটি কথা জানবার ইচ্ছা হলো। লণ্ডনের এয়ার-পোর্টে বিল পেগিকে দেখবার জন্য ডেকেছিলেন, না বিলকে দেখতে এসে-ছিল পেগি। তাদের এই যোগাযোগ কে রক্ষা করছে। এ কথা জানবার জন্য আমি জিজ্ঞাসা করলাম : আপনি কি পেগিকে এয়ারপোর্টে আসতে বলেছিলেন ?

বিল গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললেন : না।

তবে কী করে আপনাদের যোগাযোগ হলো ?

বিল বললেন : পেগিই আমাকে বলেছিল যে এদিকে কখনও এলে আমি যেন তাকে খবর দিই। তাই তাকে খবর দিয়েছিলাম।

আরও কিছু শোনবার জন্য আমি তার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

বিল একটু ইতস্তত করে বললেন : ইংলণ্ডে কয়েকদিন থেকে যাবার জন্যে সে অনুরোধও করেছিল। কিন্তু আমার একটা ভয় ছিল।

কিসের ভয় ?

সে তো আর পেগি নয়, সে মিসেস হক্স্‌ওয়ার্থ !

তাতে কী হয়েছে ! মানুষটা তো বদলে যায় নি !

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিল বললেন : এখন তাই মনে হচ্ছে।

কী বললো আপনাকে ?

বিশেষ কিছুই না। নর্মাল কথাবার্তা—কী করছি আজকাল কোথায় গিয়ে-

ছিলাম, কেমন ছিলাম, এই সব। আজ বিদায় দেবার সময় হাতে একখানা চিঠি দিয়ে বললো, আমার এক বন্ধুকে দিও।

কেমন একটু আশ্চর্য বোধ হলো আমার। কেন বন্ধুকে একখানা চিঠি সে তো ডাকেই পাঠাতে পারত! বিলের হাতে দেবার কী দরকার ছিল!

বললাম : বন্ধুর নামটা দেখুন তো!

বিল তৎপর ভাবে তার পকেট থেকে চিঠিখানা বার করলেন, আর ঠিকানাটা পড়েই খামখানা ছিঁড়ে ফেললেন। আমি চোখ রেখেছিলাম তাঁর হাতের দিকে। খামের ভিতর থেকে একখানা মোটা টাকার চেক বেরোল, আর এক টুকরো ছোট কাগজ নিচে পড়ে গেল। আমি সেটি তুলে নিয়ে দেখলাম, চারটি ইংরেজী অক্ষর—ডব্লু এ আই টি। ওয়েট। মানে অপেক্ষা কর।

আমি সেই কাগজের টুকরোটা বিলের হাতে দিতেই তার দু'চোখ ছলছল করে উঠলো জলে। সে কি কাঁদবে! আনন্দে, না বেদনায়!

৫

ঘড়ির দিকে চেয়ে মনে হলো যে অতলান্তিক মহাসাগর পেরিয়ে আমরা বোধহয় আমেরিকার মাটিব উপর দিয়ে উড়ে চলেছি। প্লেন ভেঙে পড়লে সমুদ্রে আর আমাদের সমাধি হবে না। মাটির স্পর্শেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করতে পারবো। এক রকমের অদ্ভুত আনন্দ হলো মনে। যাক, হারিয়ে তাহলে যাব না, হারিয়ে যাবার ভাবনা আর নেই।

কিন্তু হারিয়ে যাবার ভাবনা কখন হয়েছিল, তা মনে পড়ছে না। আমার সহযাত্রী বিল নিঃশব্দে আমার পাশে বসে আছেন অনেকক্ষণ থেকে। তাঁকে এখন ক্লান্ত মনে হচ্ছে। এ যে তাঁর দেহের ক্লান্তি নয়, এখন তা বেশ বুঝতে পারছি। কিন্তু দেশের মাটির কাছাকাছি এসেও তিনি আর কোনো উৎসাহ পাচ্ছেন না।

কিন্তু হঠাৎ আমার ভাবনা অন্য পথ ধরলো। এই নতুন দেশে আমাকে কি রকম আচরণ করতে হবে জানিনে। এ দেশের সম্বন্ধে আমার কোনো

অভিজ্ঞতাই নেই। দেশ ছাড়ার আগের সেই পুরনো ভাবনা—কী করতে কী করে ফেলবো, কী বলতে কী বলে ফেলবো। কেমন এক রকমের অস্বস্তি বোধ হলো, কান দুটো দিয়ে যেন গরম বের হতে লাগলো।
বিলের দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে তিনি তাঁর গায়ের কোট খুলে ফেলেছেন। কখন যে খুলেছেন তা দেখতে পাই নি। আমিও আমার কোট খুলে ফেললাম।
আমার অস্থিরতা দেখে বিল আমার দিকে চেয়ে হেসে বললেন : গরম বোধ হচ্ছে !
আমি সত্যি কথাই বললাম : বড্ড ভাবনা হচ্ছে।
কিসের ভাবনা ?
বললাম : আপনাদের দেশে খাপ খাইয়ে চলতে পারবো তো !
বিল আগের মতোই হেসে বললেন : ইংলণ্ডে যদি পেরে থাকেন তো আমেরিকায় কোনো অসুবিধাই হবে না। এ দেশে আপনি যা ইচ্ছে, তাই করতে পারেন। এ দেশে কোনো নিয়ম কানুন মেনে চলবার দরকার নেই।
অনেকটা আশ্বস্ত হয়েও আমি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।
বিল বললেন : পোশাক-আশাক নিয়ে ভাবনার দরকার নেই, আর কথায় কথায় হাত বাড়িয়ে হ্যাণ্ড শেক করারও প্রয়োজন নেই। সহজভাবে চলা-ফেরা করবেন, স্বচ্ছন্দে হাসবেন। সময় মতো আসতে না পারলেও বেশি লজ্জিত হবেন না। অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যাপারে উত্তরের আমেরিকানরা খুব পাংচুয়াল হলেও দক্ষিণের লোকেরা একেবারেই বেপরোয়া। কাজেই পাং-চুয়াল হওয়া না-হওয়ার ব্যাপারটা সবারই জানা আছে।
বিল নিজেও এখন খুব সহজ ভাবে কথা বলছেন দেখে আমি খুশী হলাম।
বিল বললেন : শুধু একটা ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন।
কোন্ ব্যাপারে ?
কারও সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করবেন না। আর এদেশের অনেক জিনিস আপনা-দের চোখে খারাপ লাগতে পারে, সে সম্বন্ধে এখানে কোনো মন্তব্য করবেন না।

তারপরেই ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেন : নিজেদের দেশের সম্বন্ধে কোনো বিরূপ মন্তব্য বিদেশীর মুখে অনেকের কাছেই খারাপ লাগবে।

বললাম : সে তো খুব ঠিক কথা। আমাদের দেশের সবাই যদি এই রকম ভাবতো, তাহলে কত ভালো হতো!

কেন, আপনারা কি নিজেদের নিন্দা শুনে খুশী হন?

বলে বিল আমার মুখের দিকে তাকালেন।

বললাম : সবাই নয়। কিন্তু লেখাপড়া জানা অনেক ধনী আছেন, যাঁরা বিদেশীদের কাছে দেশের নিন্দা করে আনন্দ পান। হয়তো ভাবেন যে এই নিন্দা করেই তাঁরা প্রমাণ করতে পারবেন যে সাধারণ ভারতীয়ের চেয়ে তাঁরা বেশি সভ্য।

বিল বোধহয় আমার কথা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তাই বললাম : এই দেখুন, আমিও তো নিজের দেশের লোকের নিন্দা করছি। নিজে এই কথা সত্য ভাবি বলেই বলছি। ভাবছি যে এতে ভারতীয়ের কোনো অসম্মান হবে না। তেমনি আর কেউ হয়তো আমাদের দেশের অল্প শিক্ষা দারিদ্র্য বা কুসংস্কার সম্বন্ধে অনেক কিছু আপনাকে বলতে পারেন। সত্যি কথা, তবু বলা ঠিক নয়। আপনারা তো কথা দিয়ে আমাদের বিচার করবেন না, বিচার করবেন কাজ দিয়ে। আমার মুখে ভারতবর্ষের নিন্দা শুনেই আপনি ভারতীয় চরিত্রের বিচার করবেন জানি।

তারপরেই বুঝতে পারলাম যে আমি ভুল করছি। নিজের কথা বলা এখন উচিত হচ্ছে না, এখন আমাকে বিলের কথাই শুনতে হবে। আমেরিকার কথা। তাই তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বললাম : হাতে এখন সময় বোধহয় খুব কম। প্লেন নেমে পড়লে আর কথা বলার সুযোগ হয়তো পাব না। আপনাদের দেশের সম্বন্ধে আরও কিছু সংক্ষেপে বলুন। এই যেমন, এয়ারপোর্টে নেমে কেমন করে আমি এগিয়ে যাব।

বিল বললেন : সেই একই কথা। এদেশে আপনাকে কোনো বড় সমস্যার সামনে পড়তে হবে না। এই কাস্টমসের কথাই ধরুন, আপনার পাসপোর্ট আছে, ভিসাও নিশ্চয়ই পেয়েছেন। ভিসা পেতে আপনাকে কষ্ট পেতে

হয়েছে কিনা জানি না, পেয়ে থাকলে ভবিষ্যতে একটা কাজ করবেন। যে-কোনো প্যান আমেরিকান এয়ার লাইন্‌সের অফিস থেকে ভিসার জন্যে ছাপানো দরখাস্তের ফর্ম্‌ একখানা চেয়ে নেবেন। তারপর সেখানা ভরে ডাকে পাঠিয়ে দেবেন ইউ এস কন্‌সুলেট অফিসে। নিজের একখানা ছবিও পাঠাবেন। ব্যস, তাহলেই হবে, ডাকেই আপনার ভিসা এসে যাবে।

বললাম : সে সব তো ঠিক আছে। এখানে নামবার পরে সহজে ছাড়া পাব তো!

বিল বললেন : কেন, সঙ্গে কোনো বেআইনি জিনিস আছে নাকি?

কী বেআইনি তা তো জানি না।

খেলাধূলোর যে-কোনো জিনিষ এমন কি মোটর বা নৌকো পর্যন্ত সঙ্গে আনতে পারেন। এক কোয়ার্ট মদ, তিন পাউণ্ড তামাক, পঞ্চাশটা চুরুট বা তিনশো সিগারেটও আনতে পারেন বিনা ডিউটিতে। কিন্তু অনুমতি না নিয়ে কোন পশু-পাখি, ফল-ফুল, গাছপালা বা মাংস আনতে পারবেন না।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম : সেকি!

বিল গম্ভীর ভাবে বললেন : ওসব থেকে রোগের বীজাণু্‌ আসে তো! কেন, আপনার সঙ্গে ওসব কিছু আছে নাকি?

হেসে বললাম : জামাকাপড় আর বই ছাড়া আমার সঙ্গে আর কিছু নেই।

নিশ্চিন্ত হয়ে বিল বললেন : তবে আর কি, কাস্টম্‌সে আপনার একটুও সময় লাগবে না।

বললাম : আপনাদের দেশে শুনেছি টিপ্‌সের ব্যাপারটা বেশ ভয়াবহ।

বিল সকৌতুকে হেসে উঠে বললেন : এ সব কথা কে আপনাকে বলেছে! কোনও হোম্‌দা মুখো ইংরেজ তো?

বললাম : না না, ইংরেজের দোষ দেবেন না। কার কাছে শুনেছি, আমার মনে পড়ছে না। বোধহয় কোনো বই-এ পড়েছি।

বিল বললেন : তবে আমার কাছে জেনে নিন। ভয় পাবার মতো কিছু

নয়।

বলে জানিয়ে দিলেন যে এরোপ্লেনে ইমিগ্রেসন বা কাস্টম্‌স অফিসে কোনো টিপিং নেই।

তবে—

বলে ভাবলেন খানিকক্ষণ, তারপর বললেন : হোটেল বা রেস্তোরাঁর বিলে সার্ভিস চার্জ ইনক্লুডেড থাকে না বলে আপনাকে একটু হিসেব করতে হবে। যেমন ধরুন, হোটেলে চেম্বার মেডকে কিছু দেবেন কি দেবেন না, তা আপনাকেই বিচার করে দেখতে হবে। যদি দু একদিন থাকেন তো কিছু দেবার দরকার নেই। যদি দেখেন যে এক একদিন এক এক চেম্বার মেড আসছে, তাহলে বেশি দিন থাকলেও আপনার ভাবনা নেই। যদি দেখেন যে একটি মেয়েই রোজ আপনার ঘর ও বিছানাপত্র গোছগাছ করে যাচ্ছে, তাহলে সপ্তাহ খানেক পরে আপনার নিজেরই কিছু দিতে ইচ্ছে করবে। তাকে দু এক ডলার দিলেই যথেষ্ট।

মনে মনে আমি হিসেব করে দেখলাম, দু ডলার মানে আমাদের ষোল টাকা। এত টাকা বকশিসের কথা আমাদের দেশে ভাবতে পারি না। তবু আমি হেসে বললাম : খুব সোজা হিসেব।

বিল খুশী হয়ে বললেন : রেস্তোরাঁর বিল দেওয়াও এমনি সোজা। বিলের ওপরে চোখ বুলিয়েই মনে মনে পনেরো পার্সেন্ট হিসেব করে নেবেন। নাইট ক্লাবে বা বড় জায়গায় গেলে কুড়ি পার্সেন্ট। কিন্তু মনে রাখবেন, অ্যামিউজমেন্ট ট্যাক্স বাদ দিয়েই এই হিসেব করতে হবে। আর কাকে কী দিতে হবে তাও বলে দিচ্ছি।

মনে মনে আমি যে ভয় পাচ্ছিলাম, মুখে তা প্রকাশ করলাম না।

বিল বললেন : হেড ওয়েটার যদি আপনাকে কোনো স্পেশাল সার্ভিস না দেয় তো তাকে কিছুই দিতে হবে না। তেমনি ডোরম্যানকে। তবে সে যদি বৃষ্টির দিনে কিংবা অত্যন্ত ব্যস্ত সময়ে আপনাকে ট্যাক্সি ধরে দেয়, কিংবা আপনার লাগেজ টানাটানির সময় সাহায্য করে, তবে আপনি নিজেই খুশী হয়ে পনেরো থেকে পঁচিশ সেন্ট তাকে দিয়ে দেবেন। হ্যাট-

চেক গার্লকেও এই পয়সা দেবেন।

জিজ্ঞাসা করলাম : মালপত্রের জন্তে পোর্টারকে কী দিতে হয় ?

বেশি নয়। একটা ব্যাগের জন্যে পঁচিশ সেন্ট্ দিলেই চলে। এয়ারপোর্টে স্টেশনে হোটেলে সর্বত্রই এক রেট।

ট্যাক্সি ড্রাইভারকেও কি টিপ্‌স দিতে হয় ?

সামান্য। শহরের ভেতর অল্প স্বল্প পথ চলার জন্যে পনেরো সেন্ট, আর দূরের পথ হলে ভাড়ার ওপরে পনেরো পার্সেন্ট। খুব সোজা হিসেব, ডলারে পনেরো সেন্ট। মানে, দশ ডলার ভাড়া উঠলে দেড় ডলার বকশিস দেবেন।

মনে মনে বললাম : সাংঘাতিক ব্যাপার। কিন্তু মুখে হাসি ফোটাবার চেষ্টা করে জিজ্ঞাসা করলাম : আর কাকে কী দিতে হয় ?

চুল কাটার জন্যে পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ সেন্ট দেবেন নাপিতকে, দাড়ি কামানোর জন্যে পঁচিশ সেন্ট। কাপড় ব্রাশ করবার জন্যে বা জুতো পালিশের জন্যে দেবেন দশ সেন্ট। ওয়াশ রুমের অ্যাটেণ্ডাণ্টদের দশ থেকে পঁচিশ সেন্ট দেবেন।

মনে মনে আমি ভাবলাম, এও নিশ্চয়ই বকশিস, মজুরির ওপরে এই বকশিস দেবার রীতি। কিন্তু কোনো প্রশ্ন করবার ভরসা হলো না। বিল বলে যাচ্ছিলেন : টিপ্‌স বেশি দিতে হয় মহিলাদের। বিউটি পার্লারে চুল কাটাবার জন্যে এক ডলার আর শ্যাম্পু গার্ল ও ম্যানিকিউরিস্ট্‌কে আধ ডলার দিতে হয়।

চুল কাটতে গিয়ে মেয়েরা বারো টাকা বকশিস দেবে, এ আমাদের স্বপ্নেরও অতীত। বিল বোধহয় কিছু সন্দেহ করেছিলেন। তাই বললেন : অবশ্য সস্তার জায়গাও আছে। আমি মোটামুটি ভালো বিউটি পার্লারের কথা আপনাকে বললাম। মানে পেগি নিজের পয়সায় এই সব জায়গায় চুল কাটতো।

পেগি এখন নিশ্চয়ই আরও ভালো জায়গায় চুল কাটায়। সে সব জায়গায় কত বকশিস দিতে হয়, তা জানবার কৌতূহল হয়েছিল। কিন্তু তার সময়

পেলাম না। প্লেন নিচে নামবে, তার সঙ্কেত পেয়েছি। সাবধানে বসতে হবে। বেশ খানিকটা উদ্বেগ এসেছিল মনে। কিন্তু বিলের মুখের দিকে চেয়ে কোনো পরিবর্তন দেখতে পেলাম না। প্লেনে ওঠা-নামায় তিনি যে অভ্যস্ত, তারই প্রমাণ দিলেন নির্বিকার ভাবে বসে থেকে। আমি কোমরে বেল্ট এঁটে শক্ত হয়ে বসে রইলাম।

যথাসময়ে আমাদের প্লেন আমেরিকার মাটিতে নামলো। অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে আমিও প্লেন থেকে নেমে এলাম। আর মাথার উপরে মধ্যাহ্নের সূর্য দেখে আশ্চর্য হয়ে উপরের দিকে তাকালাম। তারপর হাতের ঘড়ির দিকে চেয়ে যখন দেখতে পেলাম যে সূর্যাস্তের সময় হয়ে গেছে তখন আমার বিস্ময়ের আর সীমা রইলো না। একবার মনে হলো যে ঘড়িটা কাল সন্ধ্যেবেলায় থেমে গেছে, তারপরেই মনে পড়লো যে প্লেনে ওঠবার আগেও ঘড়িটা চলছিল। কিন্তু দুই দেশের সময়ের ব্যবধানের কথা সহসা আমার মনে পড়লো না।

বিল যে আমাকে লক্ষ্য করছিলেন, অমি তা দেখতে পাই নি। একটুখানি এগিয়ে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে বললেন : আশ্চর্য হচ্ছেন কেন?

আমি সত্যি কথাই বললাম : এখানেও যে মাথার ওপরে সূর্য দেখতে পাচ্ছি!

বিল বললেন : ঘড়িটা মিলেয়ে নিন, তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। এক দেশ থেকে আর এক দেশে উড়ে এলে এও একটি কাজ। লণ্ডনের সঙ্গে নিউ ইয়র্কের সময়ের তফাৎ হলো পাঁচ ঘণ্টা। আমরা পাঁচ ঘণ্টা পিছিয়ে আছি, আর আপনারা এগিয়ে আছেন ছ ঘণ্টা। অর্থাৎ আপনাদের সঙ্গে আমাদের তফাৎ এগার ঘণ্টা।

ভূগোলের কথা আমার মনে পড়ে গেল। সূর্য স্থির হয়ে আছে, আর ঘুরছে আমাদের পৃথিবী। নিজে ঘুরছে বলে দিন রাত্রি হচ্ছে, আর সূর্যকে প্রদক্ষিণ করবার জন্যে ঋতু পরিবর্তন হচ্ছে। পৃথিবী যদি কাৎ হয়ে না থাকতো, তাহলে দিন রাত্রি ছোট বড় হতো না, ঋতুর পরিবর্তনও হতো না। এ সব কথা এখন ঠিক মনে নেই। কেন এমন হয়, তাও মনে আসছে না।

ভাববার সময়ও নেই। বিল বললেন : আপনারা পূর্ব দিকে আছেন বলেই এগিয়ে আছেন। আমেরিকাও পূর্ব-পশ্চিমে বহু দূর বিস্তৃত বলে এ দেশে ইংলণ্ডের মতো একটি সময় নেই। আমেরিকায় চারটি টাইম জোন।
ভারতবর্ষেও যে এক সময় লোকাল টাইম ছিল সে কথা আমার মনে পড়ে গেল। তখন বাঙলায় ছিল বেঙ্গল টাইম। এখন ভারতের সর্বত্র এক সময়। তাই সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত সব জায়গায় এক সময়ে হয় না। ভারতীয় সময়ে চন্দ্র সূর্যে গ্রহণ লেখা হলেও কোন্‌খানে তা কখন দেখা যাবে, তা পরিষ্কার করে ছাপা হয়। কিন্তু আমি কিছু বলবার আগেই বিল বললেন : নিউইয়র্কে যখন দুপুর বারোটা, শিকাগোয় তখন সকাল এগারোটা, ডেনভারে দশটা আর সানফ্রান্সিস্কোয় সকাল আটটা। আলাস্কা হাওয়াই আর হনলুলুতেও এই সময়।
আমি কাছে আসতেই বিল এগিয়ে চললেন : আজ আপনার একটু অসুবিধা বোধ হতে পারে। তবে তেমন কিছু নয়। এখন আপনার লাঞ্চ খেতে ইচ্ছা হবে না। তার বদলে এক পেয়ালা কফি হয়তো ভালো লাগবে। ছটায় ডিনার খেয়ে নেবেন।
সন্ধ্যে ছটায় !
কেন আপনারা কি খুব দেরিতে ডিনার খান ?
আমরা !
বলে আমি একটু ইতস্তত করলাম। কলকাতার কথা আমার মনে পড়লো। নিজে আমি রাত নটার পরে খাই, কিন্তু আমার অনেক বন্ধু-বান্ধবই রাত দশটা এগারটার আগে খায় না। আমার এক বন্ধু কলকাতার বনেদী বংশে বিয়ে করেছে। তার কাছে অনুযোগ শুনেছি যে তার শ্বশুর বাড়িতে খেয়ে উঠতে রাত একটা দেড়টা হয়ে যায়। বউকে নিয়ে ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই ভোর। শ্বশুরবাড়িতে তাই তার মোটেই ভালো লাগে না। কিন্তু বিলকে এত কথা বলা চলে না। সংক্ষেপে বললাম : আমরা রাত নটায় খেতে অভ্যস্ত।
রাত নটা !

বলে বিল বিস্ময় প্রকাশ করলেন। তারপরেই বললেন : রেস্তোরাঁয় খেতে হলে খুব সাবধান হবেন।

কেন?

এখানকার ছোট শহরে রাত আটটার মধ্যেই সব রেস্তোরাঁ বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য বড় সিটিতে একটা না একটা রেস্তোরাঁ খোলা পেতে পারেন।

জিজ্ঞাসা করলাম : আপনাদের ডিনারের সময় কী?

বিল বললেন : সন্ধ্যে ছটা থেকে শুরু, আটটা সাড়ে আটটায় শেষ। বেশির ভাগ লোকই সাতটায় খায়।

ব্রেক ফাস্ট?

সকাল সাড়ে সাতটা থেকে দশটা, আর দুপুর বারোটা থেকে দুটো পর্যন্ত লাঞ্চ। এখন সবাই লাঞ্চ খাচ্ছে। ককটেল আওয়ার শুরু হবে বিকেল পাঁচটা থেকে। আমেরিকার বৈশিষ্ট্য এই ককটেল আওয়ার নিশ্চয়ই দেখে যাবেন।

মদ আমি খাইনে। তবু ভদ্রতার খাতিরে বলতে হলো : নিশ্চয়ই দেখে যাব।

যাত্রীদের যারা নিতে এসেছে, এইবারে তাদের স্পষ্ট দেখা গেল। বিলের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি দেখলাম যে তিনি ঐ জনতার দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে দেখছেন। তাঁর চোখ যেন খুঁজছে কাউকে। হঠাৎ তিনি ডান হাত তুলে চিৎকার করে উঠলেন। আনন্দের চিৎকার। ওধার থেকেও অনেকে হাত তুলে চিৎকার করছে। কাজেই আমি বুঝতে পারলাম না যে কাকে দেখে বিল পুলকিত হয়ে উঠলেন।

আমি নিঃশব্দে বিলের সঙ্গে পা ফেলে চলেছিলাম। এখানে আমাকে কেউ নিতে আসে নি। কেউ আসবে না জানি। ওয়াশিংটনে আমার পরিচিত কেউ নেই। জানাশুনো যে দু একজন আমেরিকায় আছে, আমি তাদের ঠিকানা জানি না। ঠিকানা জানলেও খবর দিতাম কিনা সন্দেহ। যাদের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখি নি এতকাল, তাদের কাছে সাহায্য, চাইতেও লজ্জা করে। আমি তাই বিলের আনন্দ দেখেই খুশী হলাম। তাঁর কাছেই শুনেছি যে

অনেক দিন পরে তিনি নিজের দেশে নিজের লোকের মধ্যে ফিরে আসছেন। আমি যখন দেশে ফিরবো, তখন আমারও এমনি ভালো লাগবে।
কিন্তু পরক্ষণেই যে দৃশ্য দেখলাম, তাতে আশ্চর্য না হয়ে উপায় নেই। বিল যাকে দেখে আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠেছেন, সে কোনো পুরুষ নয়। সে যে একটি মেয়ে, তা বুঝতে পেরেছি। তার চোখে মুখেও এমন একটি ভাব যেন এই মুহূর্তটির অপেক্ষাতেই সে ছিল। কেন জানি না, এই মেয়েটিকে আমি বিলের ছোট বোন বা আত্মীয়া ভাবতে পারলাম না। এ দেশের নিয়মে হয়তো বন্ধুর সম্পর্ক, কিন্তু আমরা একে প্রেমিকের সম্পর্ক বলি।
লণ্ডনের এয়ারাপার্টে যে দৃশ্য দেখেছিলাম, কাস্টম্‌স থেকে বেরিয়ে এসে এখানেও সেই দৃশ্যের পুনরাভিনয় দেখলাম। কিন্তু এখানকার দৃশ্যে সহজ ভাবটা বেশি, আবেগও বেশি। বিলকে নাগালের মধ্যে পেয়ে সেই মেয়েটি তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো। বিলও তাকে এমন ভাবে কাছে টেনে নিলেন যেন এ তাঁদের অনেক দিনের অভ্যাস। আমি চারিদিকে চেয়ে দেখলাম যে এই দৃশ্যের দিকে কারও নজর নেই, নজর দেবার মতো ঘটনা বলে কেউ মনে করছে না।
কয়েক মুহূর্ত পরেই বিল নিজেকে মুক্ত করে নিয়েই আমাকে ডাকলেন। আমি এগিয়ে গিয়েছিলাম, তার ডাক শুনে দাঁড়ালাম। বিল সেই মেয়েটির সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন : আমার বন্ধু মলি।
আমি জানি যে সে এই পরিচয় দেবে। এই পরিচয় থেকেই আমাকে যা বুঝবার তা বুঝে নিতে হবে। বন্ধু কথাটি যে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি এ দেশের কায়দায় চুমু খাব, না ইংরেজদের মতো হ্যাণ্ডশেক করবার জন্য নিজের ডান হাতখানা বাড়িয়ে দেবো, তা ভেবে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু মেয়েটির ঠোঁটে একটা কৌতুকের হাসি দেখেই আমার বুদ্ধি খুলে গেল। আমি তৎপরভাবে দু হাত জুড়ে আমাদের স্বদেশী কায়দায় একটা নমস্কার করলাম। মুখেও বললাম : নমস্কার।
খেতে শ্চর্য হয়ে বিকৃত উচ্চারণে বিস্ময় প্রকাশ করলেন : নমস্কার !
রাত ন হ্যাঁ। আমরা বাঙালীরা গুড মর্নিং গুড আফটারনুনের বদলে

বলি নমস্কার। অন্যান্য ভারতীয়রা বলে, নমস্তে।

পরক্ষণেই মনে হলো যে কথাটা ঠিক হলো না। উত্তর ভারতীয়রা নমস্তে বললেও দক্ষিণ ভারতীয়রা বোধহয় নমস্কার বলে। কিন্তু বিল এ নিয়ে মাথা ঘামালেন না, জিজ্ঞাসা করলেন : আপনি কোথায় যাবেন?

আমার গন্তব্যস্থলের কথা আমি তাঁকে বললাম।

বিল মলির কাছে কিছু জেনে নিয়েই আমাকে বললেন : আমরা কি আপনাকে পৌঁছে দিতে পারি?

আমি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়ে গেলাম। তবু খানিকটা সৌজন্য দেখাবার জন্যে বললাম। আপনারা কেন কষ্ট করবেন!

কষ্ট আর কী! সামান্য একটু ঘুরে গেলে যদি আপনার উপকার হয় তো তাকে কষ্ট ভাববো কেন!

সৌজন্য রক্ষার জন্যেই আমি যেন রাজী হয়ে গেলাম, এই ভাবে বললাম : আপনাদের অসুবিধা না হলে আমার আর আপত্তি কী বলুন!

বিল বললেন : সেই ভালো। আমরা এক সঙ্গেই যাব।

আর কোনো কথায় আমি এর চেয়ে বেশি আনন্দ পেতাম না। মুখে শুধু ধন্যবাদ দিয়েই মনের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম।

কিন্তু তার পরেই দেখতে পেলাম যে অন্য এক কৌতূহলে মন আমার চঞ্চল হয়ে উঠেছে। হীথরো এয়ারপোর্টের পেগির কথা আমার মনে পড়ে গেছে, তার দেওয়া খামের কথাও আমি ভুলে যাই নি। 'ওয়েট' লেখা কাগজের টুকরোটা আমিই কুড়িয়ে বিলের হাতে দিয়েছিলাম। পেগি বিলকে অপেক্ষা করতে অনুরোধ করেছিল, আর মোটা অঙ্কের চেক দিয়েছিল তাঁকে। বিল কি তার সঙ্গে প্রতারণা করবেন! অদ্ভুত একটা উদ্বেগে মন আমার অশান্ত হয়ে উঠলো।

বিল এ সব কথা ভাবছিলেন না, মলির গাড়িতে বসে আমাকে বললেন : আপনি আমার কাছে কি যেন জানতে চাইছিলেন?

সহসা আমার সে কথা মনে পড়লো না। আমি তখন পেগি বিল ও মলির সম্পর্ক নিয়েই মনে মনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু বিল নিজেই সব

মনে রেখেছিলেন, বললেন : হোটেলের কথা হচ্ছিল।

তার পরেই বললেন : ভারতীয়রা যে দেশ থেকে যথেচ্ছ টাকা আনতে পারে না, তা জানি। কিন্তু তার জন্যে ভাবনা নেই। এ দেশে সব শ্রেণীর উপযোগী ব্যবস্থা আছে। অনায়াসে আপনি কম খরচেও চালাতে পারবেন।

আমি এবারে কৌতূহলী হয়ে বললাম : কী রকম খরচ লাগবে ?

বিল বললেন : হোটেল রেস্তোরাঁর বদলে ড্রাগ স্টোরে যাবেন ব্রেকফাস্ট খেতে। কন্টিনেন্টাল ব্রেকফাস্ট খেতে আপনার কম খরচ লাগবে, রোল আর কফি। টিপিকাল আমেরিকান ব্রেকফাস্ট কিন্তু ঢের ভালো। ফলের রস, বেকন আর ডিম, টোস্ট আর কফি। খরচ একটু বেশি। সস্তায় লাঞ্চের জন্যে কুইক লাঞ্চ কাউন্টার ও কাফেটেরিয়া আছে। আর ফাস্ট ফুড রেস্টোরান্ট—ম্যাকডোনাল্ডস্ বা আরবিস। এ সব জায়গায় কম খরচেই লাঞ্চ সারতে পারবেন। আর এর চেয়েও যদি সস্তায় কাজ সারতে চান তো আমাদের প্রিয় হট ডগ বা হ্যামবার্গার নেবেন। তা না হলে কোনো হোটেল কফি শপে বা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের ডাইনিং রুমে কিংবা সাধারণ রেস্টোরান্টে একটা লাঞ্চ বা ডিনার খেতে আপনার কত ডলার খরচ পড়বে, তা জানতে আপনার সময় লাগবে।

মলি বেশ আশ্চর্য হয়ে বললো : এঁকে এত সস্তা খাবারের কথা কেন বলছ !

করুণ ভাবে বিল বললেন : এক ভারতীয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। সে বেচারা নিউ ইয়র্কে পৌঁছে উপোস করছিল।

কেন ?

তার পকেটে একটা ডলারও ছিল না। দেশ থেকে যে কটা ডলার পেয়েছিল, তা লণ্ডনেই খরচ হয়ে গিয়েছিল। আর তার যে বন্ধুর তাকে নিয়ে যাবার কথা ছিল, সে নিউ ইয়র্কে এসে তখনও পৌঁছয় নি।

তারপর ?

বিল বললেন : তার অবস্থাটা বুঝতে আমার অনেক সময় লেগেছিল। তার কারণ, এ রকম অসহায় অবস্থা আমরা কল্পনাও করতে পারি না।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : আপনি কী করলেন ?

বিল বললেন : আমি তার বন্ধুকে টেলিফোনে খবর দিলাম। সে তো আকাশ থেকে পড়লো, বললো, সে কোনো খবরই পায়নি। এখানে তো চিঠি খোয়া যায় না, ভারতে খোয়া যায় বলে শুনেছি।

লজ্জায় আমার মাথা যেন কাটা গেল। আমেরিকার লোকের কাছে ভারতবর্ষের এই পরিচয়! আমি আর কোনো প্রতিবাদ করতে পারলাম না।

মলির পরিচয়ও পেলাম। একটা অফিসে সে সেক্রেটারির কাজ করে। চাকরিতে একটা লিফ্‌ট পেয়ে হায়ার পার্চেজ সিস্টেমে নতুন গাড়ি কিনেছে। তার গাড়ি কেনবার আরও একটা কারণ আছে। গাড়ি চালাতে চালাতে আমার দিকে চেয়ে হেসে বললো : এ দেশে আপনি কত-দিন থাকবেন ?

বললাম : মাস তিনেক।

তবে তো ভালই হলো। আমাদের বিয়েয় আপনাকে আসতে হবে। আপনার ঠিকানা দেবেন, সময় মতো নিমন্ত্রণ করবো।

বিল তার পকেট থেকে নোট বুক বার করে বললেন : বলুন।

আমি একবার মলির মুখের দিকে আর একবার বিলের মুখের দিকে তাকালাম। কী জবাব দেবো ভেবে পেলাম না।

কিন্তু বিল তাড়া দিয়ে বললেন : দেরি করছেন কেন ?

আমার তো কোনো স্থায়ী ঠিকানা নেই, একটা অস্থায়ী ঠিকানা তাঁকে দিলাম।

তারপর তাঁরা আমাকে একটা হোটেলের সামনে নামিয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেলেন। এই হোটেলেই আমার ব্যবস্থা করা ছিল।

পথের ধারে নেমে আমি খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। হীথরো এয়ার-পোর্টের পেগি হক্স্‌ওয়ার্থকে আমার মনে পড়লো। বেচারা পেগি! সেই বঞ্চিত মহিলার জন্যে বেদনায় আমার মন ভরে গেল।

ভেবেছিলাম, এইখানেই শেষ হয়ে গেল বিলের কাহিনী। কিন্তু নাটকের

শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে যে আবার তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে. তা ভাবতে পারি নি।

৬

যাঁদের আমন্ত্রণে আমি এ দেশে এসেছি, তাঁরাই এই হোটেলে আমার জন্যে ব্যবস্থা করে আমাকে জানিয়েছিলেন। তাদেরই নির্দেশ মতো আমি হোটেলে উঠেই টেলিফোন করলাম। চার্লস বাল অফিসেই ছিলেন। বললেন : আমরা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি। অসুবিধা না থাকলে চলে আসুন।

ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হলো তাঁর অফিসে। চোখে পুরু কাঁচের চশমা। বয়সের ভারে দেহটাও কিছু শিথিল হয়েছে। আমাকে অভ্যর্থনা করে বসালেন, তারপর তাঁর সেক্রেটারিকে ডেকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। কনি অল্প বয়সের মেয়ে, মিষ্টি মুখ, আর ঝকঝকে চেহারা। মিস্টার বীল কনিকে বললেন : এঁর সঙ্গে কাজের কথা বলবার আগে একটু কফি খাওয়ানো যাক, কী বলো ?

মেয়েটি নিঃশব্দে চলে যেতেই আমাকে বললেন : তুমি তো এখন স্বাধীন ভারতের মানুষ ! স্বাধীনতার পরে তোমাদের কোনো উন্নতি হলো ?

তাঁর এই প্রশ্নটা আমার কানে বেশ কটু শোনালো। বললাম : আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।

ভদ্রলোক বোধহয় কোনো কটু কথা বলতে চান নি। তাই সামলে নেবার জন্য বললেন : সব স্বাধীন দেশেই তো আজকাল খুব উন্নতি হচ্ছে, তাই ভাবছি তোমাদের দেশেও হয়তো অনেক উন্নতি হয়েছে।

আমি সংক্ষেপে বললাম : তা কিছু হয়েছে বৈকি !

মিস্টার বীল বললেন : অনেক দিন আগে আমি তোমাদের দেশে গিয়েছিলাম।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম : আপনি ভারতে গিয়েছিলেন !

ভদ্রলোকের চোখে মুখে একটা আত্মপ্রসাদ ফুটে উঠলো। মাথা দুলিয়ে বললেন: সে কি আজকের কথা! তা প্রায় বছর চল্লিশের কাছাকাছি হবে।

ভদ্রলোকের মাথায় টাক পড়েছে অনেকখানি, কিন্তু মাথার চুল কালো আছে। কলপ দেওয়া চুল কিনা বুঝতে পারলাম না। আমার বিস্ময় লক্ষ্য করে বললেন: ভারতে তখন ইংরেজের রাজত্ব। তাইতেই স্বাধীন ভারতের কথা তোমার কাছে জানতে চাইছি।

আমি কতকটা লজ্জিত ভাবে বললাম: দেশ দেখতে গিয়েছিলেন বুঝি?

দেশ দেখতে!

বলে হা-হা করে হাসলেন ভদ্রলোক। কৌতুকে ছোট হয়ে গেল তাঁর দুই চোখ। আর আমি বেশ অপ্রতিভ বোধ করলাম।

হাসি থামলে ভদ্রলোক বললেন: সে যুগে ভারতে বেড়াতে যাবার কথা আমরা ভাবতেও পারতাম না। কিছুদিন আগে যেমন করে ছেলেদের ধরে ধরে ভিয়েতনামে পাঠানো হয়েছিল, তেমনি করে আমাদেরও তখন ধরে ধরে ভারতে পাঠিয়েছিল।

কেন?

তোমরা তখন বোধহয় নিতান্তই ছেলেমানুষ। তাই জাপানীদের সঙ্গে যুদ্ধের কথা তোমাদের মনে নেই। যুদ্ধ তো তোমাদের ঘরের দরজায় এসে গিয়েছিল। হিটলার আর মুসোলিনী ইংরেজদের এমন বেকায়দায় ফেলে-ছিল যে আমরা গিয়ে না সামলালে জাপানীরাই তোমাদের রাজা হয়ে বসতো।

এ হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা। আমরা জানি যে নেতাজী ভারতের বাহিরে সেনা সংগ্রহ করে ভারত থেকে ইংরেজ তাড়াবার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। বর্মার দিক থেকে মণিপুরে এসে ঢুকেছিলেন। জাপানীরা সাহায্য করছিল তাঁকে। কিন্তু সহসা যুদ্ধ থেমে গেল। আমেরিকানরা এসে জাপানে অ্যাটম বোমা ফেলেছিল। পৃথিবীর প্রথম অ্যাটম বোমা পড়েছিল জাপানের মাটিতে। শুধু হিরোশিমাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি,

জাপান নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল বিশ্বের রাজনীতি থেকে। পরাজিত জাপান যুদ্ধ ছেড়ে বাণিজ্যে মন দিয়েছিল এবং বিশ্বের সমস্ত দেশকেই পরাজিত করেছিল অল্প দিনেই। একদিন জাপানী মাল বলে যা আমরা হেয়জ্ঞান করেছি, এখন জাপানী বলেই তা সবাই সাগ্রহে সংগ্রহ করছি। আমেরিকায়ও নাকি এখন জাপানী মালে ছেয়ে গেছে।

আমাকে নীরবে থাকতে দেখে ভদ্রলোক বললেন : সেদিনের কথা বুঝি তোমার মনে পড়ছে না? তা মনে থাকবার কথা নয়। তোমরা তখন নিতান্তই ছোট ছিলে।

তার পরেই সেদিনের ভারতবর্ষের গল্প শোনালেন আমাকে। আমি জানি না, তিনি সব নিজের অভিজ্ঞতার কথা বললেন, না অন্যের কথা নিজের বলে চালিয়ে দিলেন। শুধু এইটুকু বুঝতে পারলাম যে আমাদের দেশের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা শ্রদ্ধার নয়। নিন্দার কথাগুলি তিনি যেন ইচ্ছা করেই চেপে গেলেন।

কনি দু পেয়ালা কফি এনে আমাদের সামনে রাখতেই তিনি বললেন : তোমার কফিও এখানে এনে বোসো। কাজের আগে অকাজ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাক।

কথাটা বুঝতে না পেরে আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালাম। আর তিনি কনিকে ফিরে আসতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন : মেয়েদের সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টিকে তুমি কাজ বলো, না অকাজ?

বলে সকৌতুকে আমার মুখের দিকে তাকালেন।

আমি গম্ভীর ভাবে বললাম : উঠতি বয়সে আমি তাকে অকাজ বলি না।

আর বুড়ো বয়সে?

বলি ভীমরতি।

মিস্টার বীল সরোষে বললেন : তাহলে কি তুমি বলতে চাও যে বুড়োরা মেয়েদের সঙ্গে কোনো ফষ্টিনষ্টি করবে না?

বলেই তাঁর টেবিলের খবরের কাগজখানা তুলে হাতের আঙুলে একটা জায়গা দেখিয়ে বললেন : এই বিজ্ঞাপনটা পড়ে দেখ।

কাগজখানা হাতে নেবার সময় আমি দেখলাম যে ভদ্রলোকের দু চোখ যেন আনন্দে নাচছে, উৎফুল্ল দেখাচ্ছে মুখ। বিজ্ঞাপনটা আমি পড়লাম। কোনো ভদ্রলোক বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। তাঁর বয়স সত্তর হয় নি, খুব সক্ষম না হলেও অথর্ব নন। কাজকর্ম থেকে অবসর নিয়ে বাকি জীবন একটু নিরিবিলিতে কাটাতে চান। একজন সঙ্গিনীর প্রয়োজন। বয়সে কিছু ছোট হলেই ভালো। কিন্তু দেখতে সুন্দরী হওয়া চাই। দেখা করতে পারেন, কিংবা ছবি পাঠাতেও পারেন।

বিজ্ঞাপনটা শেষ করে আমি তাঁর মুখের দিকে তাকাতেই ভদ্রলোক সহাস্যে বললেন : একে তুমি কাজ বলো, না অকাজ ?

আমি কী জবাব দেবো, তা ভেবে পাচ্ছিলাম না দেখে মিস্টার বীল কনিকে বললেন : আচ্ছা, তুমিই বলো।

কনির অল্প বয়স। বিজ্ঞাপনটা সে বোধহয় আগেই দেখেছিল। তার কানের দুটো পাশ লাল হয়ে উঠলো, কোনো উত্তর দিলো না।

কিন্তু ভদ্রলোক নাছোড়বান্দা। বললেন : উত্তর দিচ্ছ না যে ?

কনি এবারে একটা পাল্টা প্রশ্ন করলো : বিজ্ঞাপনটা কি আপনি নিজে দিয়েছেন।

ভদ্রলোক যেন আকাশ থেকে পড়লেন, এমনি ভাবে বললেন : আমি বিজ্ঞাপন দিয়েছি ?

কিন্তু কনি এবারে সপ্রতিভ ভাবে বললো : আমি কিন্তু তাই ভেবেছি।

এই স্পষ্ট উক্তিতে ভদ্রলোক নিজেই বিব্রত বোধ করলেন। একটু থমকে গিয়ে বললেন : কি যে বলো ! আমার কি আর এ রসের বয়েস আছে !

বলে নিজের কফির পেয়ালাটা তাড়াতাড়ি শেষ করে টেবিলের একখানা টাইপ করা কাগজ হাতে নিলেন। আমার পেয়ালাটি শেষ হতেই তা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন : অনেক ভেবে চিন্তে আমরা তোমার এই প্রোগ্রামটি তৈরি করেছি। এমন ভাবে এটা তৈরি করা হয়েছে যে কাজের ফাঁকে ফাঁকে এই দেশটাও তোমার দেখা হয়ে যাবে।

কাগজখানা হাতে নিয়ে আমি তার ওপরে চোখ বুলোতে লাগলাম। আর

ভদ্রলোক বলতে লাগলেন : জীবনে কাজটাই সবচেয়ে বড় নয়, আবার কাজ বাদ দিয়েও জীবন নয়। কাজ এবং অকাজ এই দুয়ের সমন্বয়েই সার্থক জীবন। তাই না ?

বলে আমার মন্তব্য শুনতে চাইলেন।

বললাম : আপনি যাকে অকাজ বলছেন, তাতে আমি তেমন পটু নই।

বলেন কি !

বলে তিনি আবার কনির দিকে তাকালেন। কিন্তু সে তাতে ভ্রূক্ষেপ না করে পেয়ালাগুলো তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছিল। মিস্টার বীল তাকে ডেকে বললেন : ফিরে এসো, আসল কাজটাই বাকি আছে।

মেয়েটি তার ঘরে পেয়ালা রেখেই ফিরে এলো। মিস্টার বীল তাকে বললেন : ওর খামটা দাও।

মেয়েটি একটি ড্রয়ার খুলে একখানা মোটা খাম এনে আমার হাতে দিলো নিঃশব্দে। মিস্টার বীল বললেন : তোমার খরচের জন্যে কিছু ডলার আছে।

খামখানা আমি পকেটে রেখে দিচ্ছিলাম দেখে তিনি বললেন : গুণে নেবে না ?

হেসে বললাম : টাকা গুণে নেবার অভ্যেস আমার নেই।

সে কি !

ঠিকই বলছি। তোমাদের কথা জানিনে, তবে আমরা কপালে বিশ্বাস করি। ভাগ্যে যা আছে, তাই জুটবে। তার বেশি না, বেশি পেলেও তা কাজে লাগবে না।

ভদ্রলোক কতকটা আশ্চর্য হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। আর মেয়েটি মুচকি হেসে নিজের ঘরে ফিরে গেল।

আমি উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। তাই দেখে ভদ্রলোক বললেন : উঠছো কেন এখনও অনেক কথা বাকি আছে।

তাই নাকি !

বলে আমি বসে পড়লাম।

ভদ্রলোক বললেন : শহর দেখার কথা তো তোমাকে বলাই হয় নি। কাল এখানে তোমার কোনো কাজ নেই কেনতা বলছি। এটা তোমার বিশ্রামের দিন নয়, এই দিনটা তোমার ওয়াশিংটন শহর দেখার জন্যে রাখা হয়েছে। পাঁচ ডলারের একখানা টিকিট আছে তোমার খামের মধ্যে। তিন ঘণ্টায় শহর দেখাবার ব্যবস্থা। তোমার হোটেল থেকেই তোমাকে তুলে নিয়ে যাবে। হ্যাঁ, ভালো কথা। হোটেল তোমার পছন্দ হয়েছে তো ?

বললাম : বেশ ভালো হোটেল।

মিস্টার বীল খুশী হয়ে বললেন : বেশ ভালো বোলো না, বল চলনসই। তোমার খরচ কম হবে বলেই এই ব্যবস্থা করেছি। কোনো লাক্সারি হোটেলে থাকবার ব্যবস্থা করলে এক দিনেই অনেক ডলার খরচ হয়ে যেত।

তারপরেই প্রশ্ন করলেন : এখানে কি তোমার খুব গরম বোধ হচ্ছে ?

বললাম : না।

তবু এখানে সবাই গরমে অস্থির হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তোমাদের দেশের গরম তো আমি জানি। একটা গেঞ্জিও আমি গায়ে রাখতে পারতাম না, শুধু সর্টস পরে থাকতাম আর খালি পায়ে চপ্পল। আমাদের এই পোশাক দেখে ইংরেজরা নাক সেঁটকাত।

বলে ভদ্রলোক হাসতে লাগলেন।

নিজের চোখে এ দৃশ্য না দেখলেও আমি শুনেছি। তাই চুপ করে রইলাম।

ভদ্রলোক এবারে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলেন : তোমার ড্রিঙ্ক্সের শখ আছে তো ! এখানে তোমার অসুবিধা হবে না, ডিস্ট্রিকট্ অফ কলম্বিয়ায় কোনো প্রহিবিশন নেই। উইক ডেজ-এ এখানে সকাল আটটা থেকে রাত দুটো পর্যন্ত সব রকম মদ পাবে। শুধু রবিবারে দুপুর একটা থেকে রাত্ত বারোটা পর্যন্ত বিয়ার আর ওয়াইন।

এর পরেই তাঁর দু চোখ হঠাৎ রহস্যময় হয়ে উঠলো, বললেন : ভালো নাইট ক্লাব আছে এখানে। শোরহাম হোটেলের টেরাসে না যাও, কোনো ছোট রেস্টোরাণ্টে যেও। সময়টা ভালো কাটবে।

এই জীবনের আস্বাদের জন্য আমি এ দেশে আসি নি। তাই বললাম : ওয়াশিংটনে দেখবার কী আছে জানতে পারলে ভালো লাগত।

ভদ্রলোক আমার কথার উত্তর না দিয়ে হাসলেন সকৌতুকে, বললেন : লজ্জা! আমার কাছে লজ্জা প্রকাশের প্রয়োজন নেই। তোমার বয়েসের অভিজ্ঞতা আমার আছে।

আমি এ কথার উত্তর না দিয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম দেখে বোধহয় ভাবলেন যে আমি আমার প্রশ্নের উত্তর চাইছি। তাই গম্ভীর হয়ে বললেন : ন্যাশনাল ক্যাপিটল দেখ, দেখ প্রেসিডেন্টের সরকারী বাসভবন হোয়াইট হাউস। ওপর থেকে দেখলে পেছনে ওয়াশিংটন মেমোরিয়ালও দেখতে পাবে। তার পেছনে পটোম্যাক নদী। সুপ্রীমকোর্ট দেখতে পার, আর পেণ্টাগন।

পেণ্টাগন কী?

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অফিস বিল্ডিং।

তারপর?

তারপর সিনেট অফিস বিল্ডিং, লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস, ফোর্ডস্ থিয়েটার পিটার্সন হাউস, লিঙ্কন মেমোরিয়াল—

বাধা দিয়ে আমি বললাম : যথেষ্ট হয়েছে, এর বেশি আমি আর মনে রাখতে পারবো না।

কিন্তু মিস্টার বীল নির্বিকার ভাবে বললেন : যদি সময় পাও তো মাউণ্ট ভার্ননে একবার নিশ্চয়ই যেও।

কেন?

জর্জ ওয়াশিংটনের বাড়ি দেখে আসবে। আমাদের একটি তীর্থস্থান।

চেষ্টা করবো দেখবার।

বলে আমি উঠে পড়লাম। বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলাম তাঁর অফিস থেকে। কনি বোধহয় নজর রেখেছিল আমার ওপরে। আমাকে বেরিয়ে আসতে দেখেই নিজে এগিয়ে এসে বললো : কোনো দরকার হলে আমাকে জানিও।

নিশ্চয়ই জানাব।

বলে আমি বিদায় নিলুম তার কাছেও।

আজ এখানকার সন্ধ্যেবেলায় কিছু খাবার ইচ্ছা হলো না। ঘুমে আমার দু চোখ জড়িয়ে আসছিল। হিসেব করে দেখলাম যে আমাদের দেশে এখন ভোর হয়ে গেছে। সেই হিসেবে সারারাত আমি ঘুমোইনি। ইংলণ্ডেও এখন মাঝরাত। তাই আমার ক্লান্ত হওয়া আশ্চর্যের নয়।

কিন্তু হোটেলের বিছানায় শুয়ে আমার ঘুম এলো না। মিস্টার বীলের একটা কথা অনেকক্ষণ থেকেই আমার মনের মধ্যে খচ খচ করছিল। প্রথম পরিচয়ের পরে অনেক কথাই হয় তো বলা চলতো। কিন্তু তিনি আমাকে এমন একটা কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যা কিছুতেই ভুলতে পারছি না। তিনি জানতে চেয়েছিলেন, স্বাধীনতার পরে ভারতের কিছু উন্নতি হয়েছে কিনা।

এ কোনো অর্থহীন উক্তি বলে আমার মনে হয় নি। তিনি ভারতে গিয়েছিলেন স্বাধীনতার পূর্বে। ভারতকে তখন একটি অসভ্য দেশ বলেই হয় তো তাঁর ধারণা হয়েছিল, ভারতীয়কে হয়তো একটি অসভ্য জাতি বলেই ভেবেছিলেন। এ ধারণা তাঁর আগে থেকেই ছিল, না ভারতে যাবার পরে হয়েছিল, তা তিনি বলেন নি। কোনো বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা তিনি গোপন করেছেন বলে আমার মনে হলো।

কিংবা এই ধারণা তাঁর একার নাও হতে পারে। আমেরিকার জনসাধারণের মনে এই রকমের ধারণা হয়তো এখনও আছে। বিদেশে এসে ভারতীয়রা এখনও এই ধারণার পরিবর্তন করতে সক্ষম হন নি বলে মনে হচ্ছে।

দেশের ছোটখাট ঘটনা আমার মনে পড়লো। অনেক আমেরিকান আসে ভারত ভ্রমণে। তাদের কাঁধে ঝোলানো থাকে দামী ক্যামেরা আর বাইনোকুলার। তাজমহলের ছবি সবাই তোলে না, আবার কোণারকের মন্দিরের গায়ের অশ্লীল ছবিও তোলে না সবাই। পয়সার লোভ দেখিয়ে অর্ধনগ্ন ভিখিরি মেয়ের ছবি তুলতেও দেখা যায়, দেখা যায় টেলিফোটো লেন্স

লাগিয়ে সমুদ্রে স্নানরতা মেয়ের অসম্বৃত মুহূর্তের ছবি তুলতেও। শুনেছি সেই সব ছবি নাকি তাদের ভ্রমণ বৃত্তান্তের সঙ্গে পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়। এমন সব ছবি যা দেখে কারও সন্দেহ থাকে না যে লেখক একটা অসভ্য দেশ দেখে ফিরে এসেছেন। এই ভাবেই আমরা আমাদের দেশের আদি-বাসীদের ছবি তুলি। আর বিদেশীর ছবি ও লেখায় আমরাই হয়তো একটি আদিবাসী জাতিতে পরিণত হই। কিন্তু এ সমস্তই আমার শোনা কথা। আমেরিকার কোনো সাময়িক পত্র আমি দেখি নি, ভারত সমন্ধে কোনো রচনা আমার চোখে পড়ে নি। কাজেই এই সংবাদ সত্য, এ কথা আমি জোর করে বলতে পারি না।

তবু আমার মাথা গরম হয়ে উঠলো। বিছানা ছেড়ে আমি উঠে পড়লাম। আরও একটা কথা আমার মনে পড়ে গেল। মিস্টার বাল আমাকে খামের ডলার গুণে নিতে বলেছিলেন আর আমি তাতে রাজী না হওয়াতে বেশ আশ্চর্য হয়েছিলেন। টাকা গুণে নেওয়া ভদ্রতাবিরুদ্ধ বলেই আমার ধারণা। তবু তিনি এই কথা কেন বলেছিলেন তা বুঝতে পারি নি। হঠাৎ মনে হলো যে ডলারগুলো গুণে নেওয়া ভালো। কম নিশ্চয়ই দেন নি, কিন্তু কত দিয়েছেন তা দেখে রাখা ভালো।

ডলার গুণে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। একবার দু'বার গুণেও দেখলাম যে অনেক বেশি ডলার দিয়েছেন। একি ভুল করে, না এ তাঁর ইচ্ছাকৃত! কিন্তু এ রকমের ইচ্ছা তাঁর কেন হবে! নানা রকমের ভাবনায় মন আমার অস্থির হয়ে উঠলো।

এখন তাঁর অফিস বন্ধ হয়ে গেছে। তাঁর বাড়ির টেলিফোন নম্বর আমার জানা নেই। খুঁজে বার করতে হবে। কিন্তু এখন কি তাঁকে বাড়িতে পাওয়া যাবে? আমেরিকার কক্‌টেল আওয়ার এখনও শেষ হয় নি। এরই সঙ্গে ডিনারের সময় শুরু হয়ে যাবে। তার পরও তাঁদের অনেক কাজ আছে—নাচ গান নাইট ক্লাব বান্ধবীকে বিয়ার বা কফি খেতে নিজের অ্যাপার্টমেণ্টে আমন্ত্রণ। কাজেই ভদ্রলোককে এখন পাওয়া যাবে না। পাওয়া গেলেও এসব কথা নিশ্চয়ই তাঁর ভালো লাগবে না। আমার কাছে

যা অনেক ডলার মনে হচ্ছে, তাঁর কাছে হয় তো তা সামান্য। এর জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে টেলিফোন করতে দেখলে তিনি হয় তো মনে মনে হাসবেন।

কাল সকালে শহর দেখার জন্য আমাকে তুলে নিয়ে যাবে। তখনও হয়তো তাঁর অফিস খুলবে না। তিন ঘণ্টা পরে আমরা ফিরবো। সেই সময়েই তাঁর সঙ্গে দেখা করে টাকাটা ফেরৎ দিতে পারবো। ফেরৎ দিতেই হবে। জেনে শুনে এ টাকা নিজের কাছে রাখতে পারবো না। আর ভদ্রলোকের কোনো উদ্দেশ্যও থাকতে পারে। নিজের মানের সঙ্গে আমার দেশের সম্মানও জড়িয়ে আছে। বিদেশে তা খোয়ালে চলবে না।

এই রকমের একটা সংকল্প নিয়েই মাথাটা সুস্থ হলো, স্থির হলো মন। নরম বিছানায় শুয়ে এবারে আমি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লাম।

৭

পরদিন সকালেই শহর দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। তিন ঘণ্টায় শহরটা দেখাবে বলে হোটেল থেকেই আমাকে তুলে নিয়ে গেল। ব্যবস্থা ভালো, বেশ আরামপ্রদ। যাত্রীরা বেশির ভাগই বিদেশী। ইউরোপের যাত্রীই বেশি মনে হলো, দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসীও হতে পারে। নিগ্রো আছে, আর অন্য দেশেরও কালা আদমি। কিন্তু ভাষার সমস্যা বোধহয় বেশি নেই। কথাবার্তা ইংরেজীতেই হচ্ছে। সবাই বোধহয় ইংরেজী বোঝেন, বলেনও অনেকে। যাত্রীদের মধ্যে আমেরিকাবাসীও থাকতে পারেন, হয়তো আছেনও অনেক। কলকাতায় আমি শহর দেখাবার ব্যবস্থা দেখেছি। সরকারী ট্যুরিস্ট বাসে শহর দেখানো হয়। তাতে বিদেশীর চেয়ে ভারতীয় যাত্রীই বেশি দেখেছি। অন্য রাজ্য থেকে যাঁরা কলকাতায় আসেন, তাঁদের অনেকেই এই ট্যুরিস্ট বাসে চেপে কলকাতার প্রধান দর্শনীয় স্থানগুলি দেখে নেন বিদেশী ট্যুরিস্টদের সঙ্গে। আমরাও অন্য রাজ্যে গেলে এই ভাবেই নতুন শহর দেখি।

এই শহরটাকে সব সময়েই ওয়াশিংটন ডি. সি. বলা হয়। ডি. সি. মানে

যে ডিস্ট্রিক্ট অফ কলম্বিয়া তা আগেই জেনেছি। কিন্তু আশ্চর্য হয়েছি এই ভেবে যে অন্য কোনো শহরের বেলায় তার নামের পিছনে এ রকমের সঙ্কেত থাকে না। তাই একটা কৌতূহল হয়েছিল। খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম যে আমেরিকার একেবারে উত্তর পশ্চিম প্রান্তে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে ওয়াশিংটন নামে একটা স্টেটও আছে। কলম্বিয়া নদী এঁকে বেঁকে প্রবাহিত হয়েছে এই স্টেটের মাঝখান দিয়ে, আর এই নদীর প্রবাহে তার দক্ষিণের সীমানাও চিহ্নিত হয়েছে। অলিম্পিয়া এই স্টেটের রাজধানীর নাম।

এখানে কলম্বিয়া নদীর নাম নয়, কলম্বিয়া ডিস্ট্রিক্টের নাম। এর আয়তন মাত্র উনসত্তর বর্গমাইল। ওয়াশিংটন এর প্রধান শহর, দেশেরও রাজধানী।

এই শহরের ইতিহাসের কথাও আমার মনে পড়ে গেল। আমেরিকা যখন স্বাধীন হয়েছিল, তখন ফিলাডেলফিয়ায় স্থাপিত হয়েছিল দেশের অস্থায়ী রাজধানী। প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন এই নূতন রাজধানীর কর্ণার স্টোন প্রতিষ্ঠা করেন। রাজধানী এখানে স্থানান্তরিত হয় তৃতীয় প্রেসিডেন্টের আমলে ১১৮০ সালের ১লা ডিসেম্বর।

আমাদের দেশে যেমন উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মানুষের আচারে ব্যবহারে অনেক ব্যবধান আছে, আমেরিকাতেও কতকটা তেমনি ব্যাপার। আবার এমন মতভেদ আছে যা রাজনীতির ক্ষেত্রেও প্রভাব বিস্তার করেছে। এই বিবাদের বলি হয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট লিঙ্কন, প্রেসিডেন্ট কেনেডিও বাদ যান নি।

দক্ষিণের দেশ বলতে যে ওয়াশিংটনও বোঝায়, এখানেই আমি তা জানলাম। মানচিত্রে এর অবস্থান দেখেছি—দেশের একেবারে পূর্ব প্রান্তে প্রায় মাঝামাঝি জায়গায়। একজন আমেরিকান যখন আমাকে বলেছিলেন যে দক্ষিণের এই ছোট শহরটিকে রাজধানী হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল, তখনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আমেরিকানদের দক্ষিণ দেশের সীমা উত্তরে এতটা এগিয়ে এসেছে।

উত্তর আমেরিকানরা সরকারী ও সামাজিক কাজকর্মে নিজেদের খুব

পাংচুয়াল ভাবেন, আর নিন্দা করেন দক্ষিণ আমেরিকানদের। কলকাতার বাঙালী এক সময়ে পূর্ববঙ্গের মানুষকে বাঙাল বলে হেয়জ্ঞান করতো। এখন সেই বাঙালরাই স্বাধীন দেশের মানুষ, বাঙলাদেশবাসী বলে সম্মান পাচ্ছেন বিশ্বে। আর কলকাতার বাঙালী পশ্চিমবঙ্গের প্রাণকেন্দ্রে অন্যের দাসত্ব করছে। ওয়াশিংটনের জন্যেও আমার একটু দুঃখ হলো। এই বিশাল দেশের রাজধানী হয়েও একটা দুর্নামের ভাগী হয়েছে।

খুব অল্প সময়েই এই শহর সম্বন্ধে আমার একটা ধারণা হয়ে গেল। সুন্দর শহর। প্রশস্ত রাজপথ, তার দু'ধারে গাছের সারি। পটোম্যাক নদী এই শহরটিকে আরও সুন্দর করেছে। আমাদের দেশের কোন্ শহরের সঙ্গে এর তুলনা করবো, ঠিক বুঝতে পারছি না। একটা শহর আর একটার মতো হয় না। তাই কারও সঙ্গে কারও তুলনা সম্ভব নয়। কখনও মনে হয়েছে যে বম্বের ফাউন্টেনের পাশ দিয়ে যাচ্ছি, কখনও মাইশোরের পথে চলেছি বলে মনে হয়েছে। কখনও বা কলকাতার কথাই মনে পড়েছে। আবার কখনও মনে হয়েছে যে এরকম শহর আমাদের দেশে একটাও নেই।

আমরা এই শহরের কয়েকটি বিশেষ জায়গা দেখলাম এবং অনেক নতুন সংবাদ পেলাম। চোখ যদি ক্যামেরার লেন্সের মতো হতো, তাহলে সেই সব ছবি পাকাপাকি ধরে রাখা সম্ভব হতো। মনের আয়নায় ছবি ধরা থাকে অস্পষ্ট ভাবে। সব দৃশ্যেরই ছায়া পড়ে, কিন্তু মিলিয়ে যায় তাড়াতাড়ি। যত দেখি, তাব সামান্যই মনে থাকে। আবার এমন দৃশ্য আছে যা সারা জীবনেও ভোলা যায় না।

এই রকমেরই একটি দৃশ্য হলো পটোম্যাক নদীর ধারে লিঙ্কন মেমোরিয়াল। ভিতরে একখানা চেয়ারের হাতলে দু'হাত রেখে সেই শহীদ প্রেসিডেন্ট বসে আছেন অনেক উঁচুতে। বিরাট মূর্তি। নিচে দাঁড়িয়ে আমরা তাঁকে দেখেছিলাম। নির্যাতিত মানুষের মুক্তির জন্য সেই মহাপুরুষ নিজের প্রাণ দিয়েছিলেন। লোকে তাই তাঁকে গ্রেন্ট ইমান্সিপেটার বলে। তাঁরই স্মৃতি-মন্দির। ড্যানিয়েল চেস্টার ফ্রেঞ্চ এই মূর্তিটি তৈরি করেছিলেন।

আমি যখন অভিভূত হয়ে এই মূর্তিটি দেখছিলাম তখন একজন সহযাত্রী

আমাকে আর একটি বিস্ময়কর স্থানের কথা বললেন। সাউথ ড্যাকোটায় গ্র্যানাইট পাথরের একটি পাহাড়ের গায়ে নাকি চারজন প্রেসিডেণ্টের মূর্তি ক্ষোদাই করা আছে। বেশ উঁচু পাহাড়। তারই গায়ে পাশাপাশি চারজন প্রেসিডেণ্টের কুড়ি মিটার আকারের আবক্ষ মূর্তি—প্রেসিডেণ্ট ওয়াশিংটন, জেফার্সন, থিওডোর রুজভেল্ট ও লিঙ্কন।

এই প্রসঙ্গেই তিনি বললেন : থিওডোর রুজভেল্টকে আপনি ভুল করবেন না। ইনি পরবর্তী কালের ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট নন। ১৯০৬ সালে থিওডোর রুজভেল্ট নোবেল পীস প্রাইজ পেয়েছিলেন। তাঁর আগে আমেরিকার কেউ এ পুরস্কার পায় নি।

এই সময়ে আমাদের দেশের কথাও আমার মনে পড়ে গিয়েছিল। দক্ষিণ ভারতের শ্রবণবেলগোলায় আমি গোমতেশ্বরের বিরাট মূর্তি দেখেছি। এক পাথরে তৈরি এতবড় বিরাট মূর্তি বিশ্বের আর কোথাও নেই। গোমতেশ্বর একালের শহীদ ছিলেন না। তিনি ছিলেন সেকালের সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, নিঃশব্দ সাধনার প্রতীক। মধ্যপ্রদেশের বাবনগজায় এর চেয়েও বড় জিন মূর্তি আছে পাহাড়ের গায়ে ক্ষোদিত। তার সঙ্গে সাউথ ড্যাকোটার প্রেসিডেণ্টদের মূর্তির তুলনা করা যায় কিনা জানি না।

ন্যাশনাল ক্যাপিটল দেখবার সময় আমার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কথা মনে এসেছিল। একই রকমের গম্বুজ বিশিষ্ট সৌধ। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মতো দোতলা বাড়ি নয়, তার সামনের প্রবেশপথও নয় তাজমহলের মতো মোগল শৈলীর। সামনে থেকে দেখলে কলকাতার পুরনো সিনেট হলের কথা মনে পড়বে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মতো মূল গম্বুজের আশেপাশে আর কোনো ছোটো গম্বজ বা মিনার নেই। এর একটি গম্বুজ, উঁচু কয়েক তলার সমান, আর তার উপরে স্বাধীনতার স্ট্যাচু। গম্বুজের গায়ে প্রতি তলায় ছোট ছোট জানালার মতো দেখা যায়।

কিন্তু এই একটি মাত্র সৌধ নিয়ে ন্যাশনাল ক্যাপিটল নয়। আশেপাশে ও সামনে আরও কয়েকটি বাড়ি আছে। আকাশ থেকে দেখলে মনে হবে

যে এই বাড়িগুলি একটি জ্যামিতির নক্সায় সাজিয়ে নির্মিত হয়েছে।
কনস্টিটিউশন অ্যাভিনিউ-এর ধারে রাজধানীর অনেকগুলি সরকারী ভবন। তাদের সবার উপরে মাথা উঁচু করে আছে ওয়াশিংটন মনুমেণ্ট। দূর থেকে ছবি তুললে একটি সাদা পেনসিলের মতো দেখাবে। তবে গোল নয়। এই স্তম্ভটি চতুষ্কোণ, তার সূক্ষ্মাগ্র আকাশের দিকে। গাইডের কথায় জানা গেল যে উচ্চতা পাঁচশো পঞ্চান্ন ফুট। পাঁচশো ফুট উপরে অবজার্ভে-শন রূমে উঠবার জন্য এলিভেটর আছে। দশ সেণ্ট খরচ করে এই এলিভেটরে চেপে উপরে ওঠা যায়। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে কোনো পয়সা লাগে না।
কলকাতার অক্টার্লনি মনুমেণ্টের কথা আমার মনে পড়লো। এখন এর নাম শহীদ মিনার। উচ্চতা মাত্র একশো বাহান্ন ফুট। তার মানে এখানকার এই মনুমেণ্ট প্রায় চারগুণ উঁচু। কুতবমিনারের উচ্চতা সহসা আমার মনে পড়লো না। কিন্তু তার সঙ্গেও এর তুলনা হয় না।
এখানকার সুপ্রিম কোর্ট দেখে আমাদের পুরনো সিনেট হলের কথা মনে পড়েছিল। যতদূর মনে আছে, তার থামগুলো ছিল গোল গোল। এর থামগুলো উপর থেকে নিচে ঢেউ খেলানো, আর উপরের দিকে সুন্দর কারুকার্য। একটি ত্রিকোণের মধ্যে নানা মূর্তি ক্ষোদিত আছে। অনেকগুলি সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে হয়।
এই সৌধের সামনে একটি গোল জলাধার দেখে আমার পাটনা হাই-কোর্টের কথা মনে পড়ে গেল। সেখানেও আমি এই রকমের একটি জলা-ধার দেখেছি, কতকটা একই রকম কায়দায় নির্মিত।
প্রেসিডেণ্টের সরকারী বাস ভবন হোয়াইট হাউস এবং বিশ্বের বৃহত্তম সরকারী দপ্তর পেণ্টাগনও দেখলাম। দেখলাম আরও অনেক কিছু। তার বেশির ভাগই মনে কোনো দাগ কাটলো না। অনেকগুলি মিউজিয়ম ও আর্ট গ্যালারি আছে এই শহরে। অর্কেস্ট্রা অপেরা ও ব্যালে। অ্যাকোয়ে-রিয়াম জু বটানিক গার্ডেন ও পার্কেরও অভাব নেই। বড় বড় লাইব্রেরি আছে। এ সব ভালো করে দেখতে হলে যথেষ্ট সময়ের দরকার। জর্জ

ওয়াশিংটনের বাসস্থান দেখবার আমি কোনো চেষ্টা করলাম না। স্বামী বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ বা মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতি বিজড়িত হলে আমি ছুটে যেতাম।

তার বদলে দুপুরের আহার সেরে আমি মিস্টার বীলের অফিসে গিয়ে উপস্থিত হলাম। তিনি অফিসে ছিলেন না, লাঞ্চ সেরে তখনও ফেরেন নি। তাঁর সেক্রেটারি কনি আমাকে তাঁরই ঘরে অপেক্ষা করতে বললো।
এক সময় সে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো ; একটু কফি খাবে ?
বললাম : ধন্যবাদ। এখন আর কিছু খাব না।
আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষার পরে সে আবার এসে বললো : তোমার কি কোনো জরুরি কাজ আছে ?
বললাম : জরুরি না হলেও কাজটা দরকারি। অপেক্ষা করতে আমার আপত্তি নেই।
এর পরেই আমার মনে হলো যে কনি বোধহয় আমার দরকারি কথাটা জানতে চাইছে। হয়তো এটা এদের অফিসের রীতি, কিন্তু সরাসরি প্রশ্ন করা সৌজন্য বিরুদ্ধ হবে বলেই তা বলছে না। কিন্তু তাকে একথা বলতে আমার কোনো দ্বিধা ছিল না বলে নিজে থেকেই বললাম : কাল বোধহয় তোমরা আমাকে কিছু বেশি ডলার দিয়ে ফেলেছ ভুল করে। সেটা ফেরৎ দিতে এসেছি।
সবিস্ময়ে মেয়েটি আমার মুখের দিকে তাকালো। তাই দেখে তাড়াতাড়ি বললাম : টাকা পয়সার হিসেব রাখতে পারিনে বলে তা গুণে নেবার অভ্যেস আমার নেই। কাল ফিরে গিয়ে কী একটা মনে হতেই—
মেয়েটির চোখের দিকে চেয়েই আমি থেমে গেলাম। আর আমি থামতেই সে বললো : তার জন্যে তুমি কষ্ট করে আবার এসেছ !
বললাম : কষ্ট আর কী !
তুমি নিশ্চয়ই হেঁটে আস নি !
না।

পরের পয়সা ফেরৎ দেবার জন্যে তুমি নিজের পয়সা খরচ করলে !
বললাম : আমার যা প্রাপ্য নয়, তা আমি কেন নেব !
মেয়েটি দুঃখিত ভাবে বললো : এ তোমাকে শাস্তি দেওয়া হলো দেখছি। কিন্তু আমি কিছু বলবার আগেই মিস্টার বীল এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু তাঁকে আমার কিছুই বলতে হলো না। তিনি বোধহয় কিছু অনুমান করেছিলেন। বাকিটা তাঁর সেক্রেটারির কাছে শুনে বেশ মুষড়ে পড়লেন। কিন্তু কনি ফিরে না গিয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।
স্বাভাবিক হতে ভদ্রলোক খানিকটা সময় নিলেন। তারপরে বললেন : তুমি তো কাল নিউ ইয়র্কে যাচ্ছ তোমার কাজ আরম্ভ করবার জন্যে ! আজ সন্ধ্যায় নিশ্চয়ই তোমার কোনো কাজ নেই !
বললাম : কেন বলুন তো ?
আজ আমরা একসঙ্গে ডিনার খেতে চাই।
আমার মনে হলো যে আমি তাঁদের লজ্জা দিয়েছি বলেই তাঁরা আমাকে এই নিমন্ত্রণ করছেন। এটাও আমার প্রাপ্য নয়। তাই বললাম : আমাকে ক্ষমা করবেন।
এবারেও কনি আশ্চর্য হলো অপরিসীম। কিন্তু কোনো কথা বললো না।
বললেন মিস্টার বীল : সন্ধ্যায় কি তোমার কোনো দরকারী কাজ আছে ? কোনো বন্ধু আছে এই শহরে ?
উত্তরে আমি বললাম : একটু নিরিবিলিতে থাকতে চাই।
কিন্তু কোথাও কিছু খাবে তো ? সেই সময়টা জানতে পারলে আমি তোমায় তুলে নিয়ে যাব। কী বলো কনি ?
বলে তাঁর সেক্রেটারির মুখের দিকে তাকালেন।
আমি কী বলবো ভেবে পেলাম না।
মিস্টার বীল বললেন : তোমাদের কন্টিনেন্টের এক বন্ধুর সঙ্গে আমি তোমার আলাপ করিয়ে দেবো ! কনিও আমাদের সঙ্গে থাকবে।
এইবারে কনি আমাকে বললো : তুমি আমাদের নিরাশ কোরো না।
খুশী হয়ে মিস্টার বীল বললেন : তাহলে এই কথাই রইলো। সন্ধ্যে ঠিক

ছ'টায় আমরা তোমাকে তোমার হোটেলের দরজা থেকে তুলে নিয়ে যাব। এর পরেও আপত্তি করা অভদ্রতা হবে ভেবে আমি সম্মত হয়ে বেরিয়ে এলাম।

আমার তো কোনো কাজ ছিল না, তাই ছ'টার আগে হোটেলে ফেরারও দরকার নেই। তাই পায়ে হেঁটেই পথ চলতে লাগলাম।

প্রথম প্রেসিডেন্ট ওয়াশিংটন তাঁর নিজের জন্মভূমির নিকটে এই ছোট শহরটিকেই একদিন রাজধানীর জন্যে নির্বাচিত করেছিলেন। কিন্তু রাজধানী স্থানান্তরিত হয়েছিল তৃতীয় প্রেসিডেন্ট জেফার্সনের সময়। পটোম্যাক নদীর ধারে লিঙ্কন মেমোরিয়ালের মতো জেফার্সন মেমোরিয়ালও আছে। পটোম্যাক পার্কও সুন্দর।

যে ফোর্ডস থিয়েটারে লিঙ্কন গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন, সেটি এখন একটি জাদুঘর। তাঁরই স্মৃতি-চিহ্নগুলি সেখানে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। দশ সেণ্ট দিয়ে ভিতরে ঢুকতে হয়। পথের উল্টোধারে পিটার্সন হাউসে লিঙ্কনের মৃত্যু হয়। এই গৃহের অভ্যন্তরও দশ সেণ্ট দিয়ে দেখতে হয়।

এই রকমের দর্শনীয় স্থান এখানে কত আছে তা আমার জানা নেই। পৃথিবীতে দর্শনীয় স্থানের কোনো অভাব নেই। আমাদের নিজের দেশেই দর্শনীয় স্থান দেখে শেষ হয় না। তাই যা দেখেছি তাতেই আমার মন ভরে গেল। হাঁটতে হাঁটতেই এক সময়ে আমি হোটেলের দরজায় পৌঁছে গেলাম। মিস্টার বীল ঠিক ছ'টাতেই এসে উপস্থিত হলেন। নিজের গাড়ি চালিয়েই তিনি এসেছিলেন। কনি তাঁর সঙ্গে ছিল। আর একজন ভদ্রলোকও এসেছিলেন। তাঁকে আমি আগে দেখি নি। মিস্টার বীল পরিচয় করিয়ে দিলেন: মিস্টার আলি, পাকিস্তানের অধিবাসী।

মিস্টার আলি আমাকে দু'হাত জুড়ে নমস্কার করে বললেন: আমি বাঙালী, বাঙলা দেশের লোক।

মিস্টার বীল বাঙলা বুঝলেও নিজের ভুলটা বোধহয় ধরতে পারলেন। তাই তৎপর ভাবে বললেন: সরি, তোমাকে আর পাকিস্তানী বলা উচিত

নয়, তুমি এখন বাঙলা দেশের লোক।

মিস্টার আলি তাঁর কথার জবাব না দিয়ে বাঙলায় আমাকে বললেন : অনেকবার এঁকে শুধরে দিয়েছি, কিন্তু কিছুতেই মনে রাখতে পারছেন না। মাঝে মাঝে মনে হয় যে এই ভুল ইচ্ছাকৃত, ইচ্ছে করেই পুরনো কথা মনে করিয়ে দিতে চান।

এঁদের সামনে বাঙলায় সংলাপ আমার ভালো লাগছিল না। কিন্তু উপায় নেই, ইংরেজীতে মিস্টার আলি এ রকমের কোনো মন্তব্য করতে পারেন না। মিস্টার বীল আর কিছু না বলে আমাদের দু'জনকে পিছনে তুলে দিয়ে কনিকে নিয়ে গাড়ির সামনে বসলেন। তারপর খানিকটা এগিয়ে বললেন : কিছু মনে কোরো না, আমি তোমাদের তেমন ভালো জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি না।

মিস্টার আলি বোধহয় এখানকার পুরনো লোক এবং দু'জনের পরিচয়ও বোধহয় অনেক দিনের। তাই মিস্টার আলিকে বললেন : ভালো জায়গা বলতে তো তুমি লাইফ অ্যাণ্ড ফর্ক বা গোল্ডেন অক্স বোঝ, তাই না!

মিস্টার আলি বললেন : কেন, জকি ক্লাব, পল ইয়ংস, ট্রেডার ভিক্স—এ সবও খারাপ নয়!

কিন্তু মিস্টার বীল আমাদের যেখানে আনলেন, তা বোধহয় মাঝারি জাতের রেস্তোরাঁ। গাড়ি থেকে নেমে কনি আমাকে চুপি চুপি বললো : ইটালিয়ান ডাচ বা জর্মন খানা না চাইলে এখানে তোমার মন্দ লাগবে না। আমার ভালো লাগে।

মিস্টার বীল শুনতে পেয়েছিলেন। বললেন : সেইজন্যেই তো এখানে আসি।

বলে কনির দিকে চেয়ে রসিয়ে হাসলেন। ভদ্রলোকের নাতনির বয়সী না হলেও বেশি বয়সের মেয়ের মতো নিশ্চয়ই। তাই সে লজ্জা পেল বুড়োর এই মন্তব্য আর হাসিতে।

একটা টেবিলের চারধার ঘিরে আমরা বসলাম। মিস্টার বীল প্রথমে আমাকেই বললেন : তোমার ফেভরিট ড্রিঙ্ক কী বলো।

হেসে বললুম : জল।

সবাই আশ্চর্য হলেন আমার কথা শুনে। মিস্টার আলি বললেন : সত্যিই কিছু খান না ?

বললাম : অভ্যেস নেই, কোনোদিন খাই নি।

মিস্টার বীল বললেন : খেলেই অভ্যেস হবে। কিছু খাও।

বললাম : ক্ষমা করুন আমাকে।

এর পরে মিস্টার বীল আর জোর করলেন না। মিস্টার আলির দিকে তাকাতেই তিনি বললেন : মার্টিনি।

তারপর কনির দিকে তাকাতেই সে বললো : কোক।

এই বয়সে কোক খাবে কেন !

বলে মিস্টার বীল দু'জনের জন্যেই মার্টিনি, নিজের জন্যে ভড্কা আর আমার জন্যে কোকের অর্ডার দিলেন। কোক কোকাকোলার মতো পানীয়। পরে দেখেছিলাম যে সেভেন আপ নামে সোডা জাতের একটা পানীয়েরও জল আছে। তার পরে মিস্টার বীল আমাকে বললেন : ইণ্ডিয়ানরা দেখছি সাধুর দেশের লোক।

কনি কিছু বিস্মিত হলো এই মন্তব্য শুনে। আর মিস্টার আলি আমাকে বললেন : এ দেশে আপনার অসুবিধা হবে না। এরা জল খেতে জানে, তাই সর্বত্র জল পাওয়া যায়। কিন্তু ইংলণ্ডে মদ না ছুঁয়ে আপনাকে বিয়ার খেতে হবে জলের বদলে।

এই অসুবিধার অভিজ্ঞতা আমার আছে। তাই কোনো উত্তর দিলাম না।

মিস্টার বীল বললেন : ইণ্ডিয়ায় আমারও বিপদ হয়েছিল। সর্বত্র জল পাওয়া যায়। কিন্তু ভড্কা বা মার্টিনি পাওয়া যায় না। এমন কি বিয়ার পর্যন্ত না।

একটা ভড্কা শেষ করেই বললেন : একবার কি বিপদে পড়েছিলাম বলি।

বলে গল্পের ফাঁকে ফাঁকে আরও দুটো শেষ করে ফেললেন। তাঁর কথা শুনে বুঝতে পারলাম যে একবার তাঁদের পদ্মা পেরিয়ে বার্মার জঙ্গলের

দিকে যেতে হয়েছিল। সঙ্গে যত মদের বোতল ছিল, তা ফুরিয়ে গেল তাড়া-তাড়ি। তারপর সে কি করুণ অবস্থা! নোংরা জল ছাড়া আর কিছু নেই।

মিস্টার আলি বললেন: কান্ট্রি লিকর?

খুশী হয়ে মিস্টার বীল বললেন: সেই গল্পই তো বলছি। অনেক খুঁজে পেতে এক দোকানে গিয়ে উপস্থিত হলাম। দোকান তো নয়, একটা গোয়ালও তার চেয়ে পরিষ্কার। আমার সঙ্গে ছিল এক বন্ধু। দুর্গন্ধে সে পালাতে চাইছিল। কিন্তু যাবে কোথায়! শেষ পর্যন্ত দু'জনে সেই চালার নিচে বসে কয়েকটা বোতল সাবড়ে দিলাম।

কয়েক বোতল!

বলে মিস্টার আলি তাঁর নিজের মার্টিনিও শেষ করে ফেললেন। কিন্তু মিস্টার বিল সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করলেন না। কনির দিকে চেয়ে দেখলাম যে সে তার গেলাসে একটু একটু করে চুমুক দিচ্ছে অনুরোধে ঢেঁকি গেলার মতো কায়দায়।

মিস্টার বীল তাঁর নিজের জন্যে আর একটা ভড্কার অর্ডার দিয়ে বললেন: তার পরে কি হয়েছিল শোনো। রাতে আমরা আর ফিরতে পারি নি, পথের ধারেই সারা রাত পড়েছিলাম। সকাল বেলায় চোখ মেলে দেখি, হাতে ঘড়ি নেই, পকেটে পয়সাও নেই একটা।

মিস্টার আলি বললেন: সব চুরি হয়ে গেল!

ভদ্রলোক গম্ভীর ভাবে বললেন: একজন ইণ্ডিয়ান—

বাধা দিয়ে মিস্টার আলি বললেন: ইণ্ডিয়ান বলছো কেন! তুমি যেখানকার কথা বলছো সে তো এখন বাঙলা দেশ! তার আগে পাকিস্তান ছিল।

মিস্টার বীল সোজা হয়ে বসে বললেন: পাকিস্তান! আমরা তো পাকিস্তানে যাই নি, যুদ্ধ করতে আমরা ইণ্ডিয়ায় গিয়েছিলাম।

মিস্টার আলি বললেন: তোমরা যখন ওদিকে গিয়েছিলে, তখন পাকিস্তান ছিল না, বাঙলা দেশও না। সে সময়ে যারা তোমার জিনিস চুরি করে-ছিল তারা এখন বাঙলা দেশের লোক।

মিস্টার বীলের চোখে নেশার আমেজ লেগেছিল, কতকটা আর্তনাদের

মতো সুরে বলে উঠলেন : তবে আমি ইণ্ডিয়ানদের কেন চোর বলি দে
দেখি, অকারণে আমি এতদিন ইণ্ডিয়ানদের দোষ দিয়ে এসেছি !
বলে করুণভাবে কনির দিকে তাকালেন।

আহারের পর রেস্তোরাঁর বাইরে এসেই কনি মিস্টার বীলের কাছে বিদা
চাইলো। কিন্তু মিস্টার বীল সবিস্ময়ে বলে উঠলেন : সেকি, আর্ণ্ট ই
ফ্রী টু হ্যাভ এ বিয়ার উইথ মি, বেবি ?

অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে কনি ক্ষমা চেয়ে বললো : একটা অত্যন্ত জরু
কাজ আছে আমার।

বলেই আমাদের কাছে বিদায় নিয়ে উল্টো দিকে হাঁটতে লাগলো।

মিস্টার বীল আমাকে হোটেলের সামনে নামিয়ে দিয়ে মিস্টার আলিকে
নিয়ে চলে গেলেন।

আমি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম পথের ধারে। এ দেশের আকাশ
আমাদের আকাশের মতো নীল, অসংখ্য তারা একই রকম মিটমিট করে
জ্বলছে। কিন্তু চাঁদ দেখতে পাচ্ছি না।

হঠাৎ একটা ট্যাক্সি এসে আমার পাশে দাঁড়ালো। আমি আশ্চর্য হয়ে
দেখলাম যে কনিই ট্যাক্সি থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে দিচ্ছে। আমাকে
দেখতে পেয়েই খুশিতে ঝলমলে হয়ে বললো : তোমার কাছেই এলাম।

আমি বিস্ময় প্রকাশ করে বললাম : আমার সঙ্গেই তোমার জরুরি কাজ
তবে একসঙ্গে এলে না কেন ?

কনি সহাস্যে বললো : বুড়োকে লুকিয়ে তোমাকে একটা কথা বলতে
এলাম। বুড়োর কথা আমি বিশ্বাস করতাম না বলে সে আমার সঙ্গে
বাজি লড়েছিল। সে বলেছিল, অতিরিক্ত ডলারগুলো তুমি চুপচাপ পকেটে
রেখে দেবে। তাই কাল আমাদের হারজিৎ হয় নি। আজ বাজি হেরে
গিয়েই ও আমাদের খাইয়েছে।

কনিকে এখন আমার অন্য মেয়ে বলে মনে হচ্ছে। আমাদের দেশের
মেয়ের মতোই সরল ও প্রাণবন্ত মেয়ে। তাকে বলবার মতো কোনো কথা
আমি সহসা খুঁজে পেলাম না।

৮

কনি বললো : তুমি খুব আশ্চর্য হচ্ছো, তাই না ?

বললাম : তা একটু হয়েছি বৈকি। কিন্তু তার চেয়েও বেশি ভালো লাগছে।

কেন ?

সত্যিই তোমার যদি কোনো জরুরি কাজ না থাকে তো কিছুক্ষণ গল্প করা যাবে।

কনিকে তখন আর মিস্টার বীলের সেক্রেটারি বলে মনে হচ্ছে না, মুখে সেই গম্ভীর ভাব আর নেই। তার বদলে হেসে বললো : আমার সঙ্গে গল্প করতে কি তোমার ভালো লাগবে !

ভেতরে এসে দেখ, ভালো লাগে কিনা।

বলে তাকে হোটেলের লাউঞ্জে নিয়ে এলাম, নিজের ঘরে আসতে বলার সাহস আমার হলো না। মেয়েটি হয়তো আমাকে ভুল বুঝতে পারে। বসবার পরে বললাম : তোমরা কি এখন বিয়ার খাও ?

কনি আমার মুখের দিকে তাকালো সন্দিগ্ধ চোখে। তাই দেখে তাড়াতাড়ি বললাম : মিস্টার বীল তোমাকে বিয়ার খাবার জন্যে ডেকেছিলেন কিনা, তাই জিজ্ঞেস করছি। আমি তো ও সব খাইনে, তবে হোটেলে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

কনি আমার কথায় প্রথমটা বেশ লজ্জা পেয়েছিল। এইবারে সহজভাবে হেসে বললো : এ দেশের কায়দা কানুন তুমি জানো না বলেই এ কথা বলতে পারলে। এর পরে আর কোনো মেয়েকে এ কথা বোলো না।

এবারে আমি লজ্জা পেয়েও জিজ্ঞাসা করলাম : কেনো বলতো !

কনি বললো : ছেলেরা একটা বিশেষ অর্থে মেয়েদের ঐ ভাবে ডাকে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে।

আমি আশ্চর্য হলাম এই কথা শুনে। ফ্ল্যাটকে এরা অ্যাপার্টমেন্ট বলে।

মিস্টার বীল বিপত্নীক বলে জানি, তাই তিনিই কাগজে একজন সঙ্গিনীর জন্যে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন বলে কনি সন্দেহ করেছে। এই বয়সে ভদ্রলোক কনির মতো একটি ছেলেমানুষ মেয়েকে নিজের অ্যাপার্টমেণ্টে ডাকবে, এ আমার কাছে বিস্ময়কর মনে হলো। যথেষ্ট বয়েস হয়েছে ভদ্রলোকের, কিন্তু এই বয়সেও তাঁর চপলতা গেল না !

কনি বোধহয় আমার মনের কথা বুঝতে পারছিল, বললো : এত আশ্চর্য হচ্ছো কেন ! এদেশে এখন কিছুদিন থাকবে তো, চোখে তোমার সবই সয়ে যাবে !

পরক্ষণেই বললো : না, তা বোধহয় ঠিক নয়। আমি তো সব কিছু সইতে পারি না, বিদ্রোহ করি এখনও। কিন্তু কেন করি, কেন গা ভাসিয়ে দিতে পারি না সবার মতো ?

প্রশ্নটা বোধহয় সে নিজেকেই করেছিল। তবু আমি একটা উত্তর দিলাম : যার ব্যক্তিত্ব আছে, তার ভালো লাগার ব্যাপারটা একেবারেই নিজস্ব। সমাজের বিধি নিষেধের কোনো দাম নেই, অন্যের ভালো লাগারও মূল্য নেই কোনো।

কিন্তু কেন এমন হয় বলতে পার ?

মানুষের মনের কথা বোধহয় বিধাতাও বোঝেন না। তবে আমার মনে হয় যে যারা দেহের চেয়ে মনকে বড় ভাবে, ব্যক্তিত্ব আছে তাদেরই। তারা সাধারণ নয়।

কনি বললো : তোমার কথা বোধহয় ঠিক। দেহটাকে আমরা বোধহয় এখন বেশি দাম দিচ্ছি। তুমি তো কাল নিউইয়র্কে পৌছবে। পথে ঘাটে দোকানের জানলায় তুমি নানা রকমের বিজ্ঞাপন দেখবে—মেয়েদের দেহটাকেই নানাভাবে নানা কায়দায় তুলে ধরা হয়েছে পুরুষের চোখের সামনে। কিন্তু এদেশের কোনো মেয়ে একে অপমান বলে ভাবে না। পৃথিবীতে পুরুষের লোভের কি ঐ একটিই জিনিষ, না পুরুষকে প্রলুব্ধ করাই মেয়েদের একমাত্র কাজ !

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কনি যোগ করলো : নিউ ইয়র্কে যেতে তাই আমার

ঘেন্না করে।

আমি আস্তে আস্তে প্রশ্ন করলাম : অন্য শহরে কি এ রকম নেই ?

কনি বললো : আছে সর্বত্র, কিন্তু এমন বীভৎস ভাবে নয়।

নিউ ইয়র্ক আমি এখনও দেখি নি, তাই কোনো মন্তব্য করতে পারলাম না। কিন্তু কনি আমাকে প্রশ্ন করে বললো : তোমাদের দেশেও কি মেয়েদের এমনি অসম্মান ?

না দেখে তুলনা করা সম্ভব নয়। তবু একটা উত্তর আমাকে দিতে হলো। বললাম : আমাদের দেশে মেয়েদের অসম্মান অন্য রকমের।

কেমন ?

বলে কনি আমার মুখের দিকে তাকালো।

বললাম : আমরা গরিব দেশের মানুষ। অভাব আমাদের ঘরে ঘরে। তাই আমাদের দেশের অনেক মেয়ে জীবনে আনন্দ উপভোগে বঞ্চিত হয়।

কেন ?

কেউ ঘরের কাজে সারাদিন আবদ্ধ থাকে, কেউবা রোজগারের জন্যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে। পুরুষদের সঙ্গে মেয়েরাও বাঁচবার জন্যেই যুদ্ধ করে যাচ্ছে।

কনি বললো : উচ্ছৃঙ্খল জীবনের আনন্দের চেয়ে সে অনেক ভালো।

আমি তাকে বললাম না যে আমাদের দেশেও খুব দ্রুত পরিবর্তন আসছে। মেয়েরা ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়েছে, সংসার ছেড়ে ঢুকেছে অফিসে আদালতে। জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে তারা এখন পুরুষদের সঙ্গে সামনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। জীবনটাকেও উপভোগ করতে শিখেছে ধনী সমাজের মেয়েরা। অদূর ভবিষ্যতে হয় তো তারা এই মার্কিন সমাজটাকেই আমদানি করবে দরিদ্র ভারতে। কিন্তু কনিকে এ সব কথা বলা যায় না।

কনি বোধহয় আমাকে লক্ষ্য করছিল, বললো : কী ভাবছ বলতো !

আমি তাকে সত্যি কথাই বললাম : আমাদের সমাজের কথাই ভাবছি। তোমাকে যা বললাম, সে আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজের কথা। আমি নিজে এই সমাজের লোক। ভারতে অনেক ধনীও আছে, তাদের কথা আমি

জানি না। তোমরা হয়তো কিছু জানো!

আমরা!

বললাম : তারা এদেশে আসে, ছেলেমেয়েদের পাঠায় লেখাপড়া শিখতে। ফিরে গিয়ে তারা কী রকম জীবন যাপন করে তা আমরা গল্প-উপন্যাসে পড়ি। কিন্তু যারা সে সব লেখে তারা আমাদের মতো মধ্যবিত্ত বলে সে সব সত্য বলে মনে হয় না। এ দেশে তোমরা যাদের দেখো, তাদের অনেকেই ধনী সমাজের প্রতিনিধি। সেইজন্যেই বলেছি যে আমার চেয়ে তোমার অভিজ্ঞতা হয় তো বেশি।

কনি গম্ভীর হয়ে রইলো দেখে বললাম : ঠিক বলি নি?

কনিও মিথ্যা বলতে পারলো না। বললো : বড় তাড়াতাড়ি তারা বদলে যায়!

তার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হলো যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে তার, কিন্তু সে কথা বলতে পারছে না। সরাসরি তাকে কোনো প্রশ্ন না করে বললাম : না জানলেও আমরা অনুমান করতে পারি। ফেরার পরে পরে তাদের অনেককে আমরা চিনতে পারি না।

কনি একটু ইতস্তত করে বললো : তুমি লেখক, মানুষের জন্যে তোমার দরদ আছে। তাই তোমার কাছে আমি লুকোব না।

বললাম : লুকোবার দরকার তো নেই।

কিন্তু লজ্জা আছে।

আমি বলতে পারলাম না, তবে থাক। তার বদলে আরও কিছু শোনবার জন্যে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

কনি বললো : একটি ভারতীয় ছেলের সঙ্গে আমার ভাব হয়েছিল। সে এখানে পড়তে এসেছিল, আমিও তারই সঙ্গে পড়তাম। ছেলেটা খুব সরল ছিল, তাই তাকে আমার ভালো লেগেছিল। তার সঙ্গে আমি কথা বলতাম বলে সে আমাকে বেশ ভক্তি করতো। তারপর আরও কয়েকটা মেয়ে যখন তার সঙ্গে কথা বলতে লাগলো, তখন সেও বদলাতে লাগলো।

কী রকম?

একদিন শুনলাম, একটা মেয়ের সঙ্গে ডেটিং, আর একদিন আর একটা

মেয়ের সঙ্গে। তারপর দেখলাম যে পড়াশুনা ছেড়ে মেয়েদের নিয়েই সে মেতে উঠেছে। আমার চোখের দিকে সে আর তাকায় না, তাকায়—

বলে সে থেমে গেল।

বললাম : বুঝেছি।

কনি বললো : হ্যাঁ। তাই আমি নিজে থেকেই দূরে সরে এলাম।

একটু থেমে আবার বললো : কেন এমন হয় বলতে পারো ?

আমি জানি যে এ প্রশ্নের উত্তর তার জানা আছে। তাই বললাম : এই রকমই তো হয় !

কনি বললো : কেন তা হবে ! ছেলেমেয়ের মধ্যে কি মনের কোনো সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না ?

বললাম : এখনও আমরা মনের সম্পর্ককে শ্রদ্ধা করি বলে তাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করি।

সে কথা শুনেছি বলেই আমি তোমাদের শ্রদ্ধা করি।

কোথায় শুনেছ ?

কনি বললো : আমার এক বন্ধুর কাছে। সে সম্প্রতি তোমাদের দেশটা দেখে এসেছে।

একা ?

না। একা নয়। তারা এক দল ছেলেমেয়ে একসঙ্গে গিয়েছিল। ভারতের অনেক জায়গা তারা দেখেছে। অনেক মানুষও দেখেছে তারা। আমাদের পড়া ভারতের সঙ্গে নাকি তাদের দেখা ভারতের কোনো মিল নেই। আমার বন্ধু বলে, ভারি আশ্চর্য দেশ। ভারি সুন্দর ও সরল। গরুর গাড়ির সঙ্গে প্লেনও চলছে। ফাইভ স্টার হোটেলের কাছেই বস্তির মানুষ না খেয়ে মরছে। আর ইউনিভার্সিটির শহরেই অসংখ্য নিরক্ষর মানুষের বাস। তবু তাদের ভালো লেগেছে সবকিছু।

বললাম : বেশি দিন হয়তো এ রকম থাকবে না।

কনি বললো : হ্যাঁ। আমার বন্ধু বলে। বিদেশীরাই দেশটাকে নষ্ট করবার চেষ্টা করছে প্রাণপনে।

আমি আশ্চর্য হলাম এই কথা শুনে। এ যেন আমাদেরই মনের কথা। সুদূর আমেরিকার কোনো মেয়ের মুখে একথা শুনবো, তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। কনি এবারে আরও স্পষ্ট করে বললো : ভারতের লোক নাকি আমাদেরই দোষ দেয়। আমরাই নাকি সে দেশের তরুণদের উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠতে সহায়তা করছি। কথাটা কি সত্যি ?

বলে সে আমার দিকে মুখ তুলে রইলো।

এ কথা সমর্থন করবার মতো দুঃসাহস আমার নেই। তাই বললাম : জানি না।

কনি বললো : জানি না নয়, বলো বলবে না।

বললাম : ঠিক তা নয়। অনেকে অনেক কথা বলে। কিন্তু নিজের মনে কোনো প্রত্যয় না জন্মালে কোনো দেশকে দোষ দেওয়া যায় না। তবে একটা কথা ঠিক।

কী ?

তোমাদের সিনেমা ফিল্ম বই ও পত্র-পত্রিকা আমাদের ছেলেমেয়েদের ওপরে খুবই প্রভাব বিস্তার করেছে। তাতে তোমাদের সমাজের যে চিত্র পাওয়া যায়, তা সত্য ভেবে অনেকেই সে সবের অনুকরণ করছে।

কনি আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলো দেখে বললাম : তোমাদের একটা ছবি ট্যাক্সি ড্রাইভারের কথাই ধর। তোমাদের সিকিউরিটি ব্যবস্থার কড়া-কড়ির জন্যে প্রেসিডেণ্টকে গুলি করে মারা কিছুতেই সম্ভব নয়। কিন্তু তাই দেখে আমাদের রাষ্ট্রপতিকে মেরে কেউ যদি বীরত্ব দেখাতে চায়! কিছুদিন আগে আমাদের দেশেরই একটা পার্বত্য জাতির যুবকেরা তাদের প্রণয়িনীদের কাছে বীরত্ব প্রমাণ করবার জন্যে আশে পাশের গ্রাম থেকে মানুষের মাথা কেটে আনতো। সে সব নিয়ে যদি গল্প লেখা হয় বা ছবি তৈরি হয়, তাহলে সমাজের কি ভালো হবে! কোনো দেশের ভালো দিকের বদলে যদি শুধু খারাপ দিকটাই দেখতে হয় ছবিতে ও লিটারেচারে, তবে কেউ সে দেশের দোষ দিলে বোধহয় তাকে দায়ী করা চলে না। অথচ তোমরাই সবার আগে চাঁদে গিয়েছ, চেষ্টা করছো আরও দূরে যাবার।

কই, তোমাদের এই চেষ্টা তো আমাদের তরুণদের মধ্যে সঞ্চারিত করছে না। আমাদের কোনো তরুণ তো এ দেশ থেকে মঙ্গলে যাবার প্রেরণা নিয়ে নিজের দেশে ফিরছে না!

আমার মধ্যে বোধহয় একটা আবেগ এসেছিল। তাই দেখে কনি আমাকে জাগিয়ে দিলো : আমরা ছেলেমেয়েদের নৈতিক চরিত্র নিয়ে আলোচনা করছিলাম!

আমি তখনই সংযত হয়ে বললাম : সে কথাও থাক। তার চেয়ে তুমি নিউ ইয়র্কের সম্বন্ধে কিছু বলো। অত বড় একটা শহরে পৌঁছে যাতে বিপদে না পড়ি, তার জন্যেই কিছু উপদেশ দাও।

কনি হেসে বললো : বিপদে পড়বে কেন!

আমিও হেসে বললাম : পড়তেও তো পারি।

কনি কিছুক্ষণ থাকবে জেনে আমি কফি দিতে বলেছিলাম। সেই কফি আসতেই কনি বললো : তার মানে এবারে আমাকে নিউ ইয়র্কের কথা বলতে হবে, এই তো!

কফিতে একটা চুমুক দিয়ে আমি বললাম : তাতে আমার খুব উপকার হবে।

কফি খেতে খেতেই কনি আমাকে নিউ ইয়র্কের অনেক কথা বললো। প্রথমেই বললো : ভারি মজার জায়গা। কে নিউ ইয়র্কের পুরনো বাসিন্দে, আর কে নতুন, তা তুমি বুঝতেই পারবে না। নতুন ও পুরনো সবাই নিউ ইয়র্কের বলে বেশ গর্ববোধ করে। আর বিদেশী বা অন্য শহরবাসী আমেরিকান দেখলে তারা নানা রকমের উপদেশ দিতে খুব ভালবাসে।

কী ধরনের উপদেশ?

এই শহরে কেমন করে চলাফেরা করতে হয়। তাদের সভ্যতা-ভব্যতা নিয়েই উপদেশ। নিউ ইয়র্ক যেন তাদের দেশ, তাই সেখানকার হালচাল শেখানো যেন তাদের কর্তব্য—এই রকমের একটা ভাব আছে সবার মধ্যে।

বললাম : সে তো ভালো কথা। নিজের দেশের সম্বন্ধে গর্ববোধ করা তো

সবারই উচিত।

কনি বললো : নিউইয়র্ক তো দেশ নয়, এ একটা শহর!

এর পরই সে শহরের কথা বললো : পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শহর কোন্‌টা তা তো জানিনে, তবে আমেরিকায় নিউইয়র্কের চেয়ে বড় শহর নেই। এর আয়তন শুনেছি তিনশো পঁয়ষট্টি স্কোয়ার মাইল। এর মধ্যে ছেষট্টি স্কোয়ার মাইল জলও আছে।

আমি আশ্চর্য হলাম অপরিমিত। একটা শহরের এত বড় আয়তন আমি ভাবতে পারি না, আর শহরের মধ্যে এতখানি জলও ভাবা যায় না। আমি যে আশ্চর্য হয়েছি তা বুঝতে পেরে কনি বললো : হাডসন নদী এসে অ্যাটলান্টিক মহাসাগরে পড়েছে। সেই মোহনার ওপরে এই শহর, আর ম্যানহাটন নামে একটা দ্বীপে এই শহরের কেন্দ্রস্থল। শহরের আরও চারটি অংশ আছে—ব্রুক্‌লিন, আর কুইন্স লং আইল্যাণ্ডে, স্টাটেন আই-ল্যাণ্ডে রিচমণ্ড আর মেনল্যাণ্ডে ব্রঙ্ক্‌স। এই শহরের লোকসংখ্যা কত জানো?

বললাম : জানি না।

ছিল আশি লাখ, আর সমস্ত মেট্রোপলিটান এরিয়া নিয়ে এক কোটি তিরিশ লাখ, এখন নিশ্চয়ই আরও বেড়েছে।

হেসে বললাম : অনেক দেশে এত লোকসংখ্যাই নেই।

কনি গর্বিতভাবে বললো : তবেই বোঝ, এ কত বড় শহর। কিন্তু লোক-গুলো সারাক্ষণ নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত। পোশাক সম্বন্ধে ভারি রক্ষণশীল। টাই না পরে বা কোট গায়ে না দিয়ে কোনো রেস্তোরাঁতে খেতে গেলে হয়তো অপদস্থ হতে হবে, হয়তো খাবারই দেবে না। সন্ধ্যেবেলায় ছেলেরা পরবে বিজনেস স্যুট, আর মেয়েরা খাটো ককটেল স্টাইলের পোশাক। বড় বল্ বা ভালো থিয়েটার ছাড়া এই পোশাক সর্বত্র চলবে।

থিয়েটার!

কেন, তোমরা থিয়েটার ভালবাস না?

বাসি। কিন্তু আমাদের দেশে সিনেমার প্রতিপত্তিই বেশি।

মোশান পিক্‌চার্স ! কিন্তু নিউ ইয়র্কে তুমি উল্টো দেখবে। থিয়েটারের যে আভিজাত্য, মোশান পিক্‌চার্সের তা নেই। এমন কি কোনো আর্টিস্ট যদি একবার ব্রডওয়ে থিয়েটারে চান্স্‌ পায় তো তার কপাল ফিরে যায়। নিউ ইংলণ্ডের যে-কোনো থিয়েটারে সে হিরোর পার্ট করবার সুযোগ পাবে। চেষ্টা করে একটা থিয়েটার তুমি নিউ ইয়র্কে নিশ্চয়ই দেখো।

সত্যি বলতে কি, থিয়েটার দেখবার শখ নিয়ে আমি এদেশে আসি নি। কিন্তু কনির আগ্রহ দেখে বলতে হলো : চেষ্টা করবো।

কনি বললো : টিকিট পাওয়া তোমার পক্ষে খুব শক্ত হবে, বিশেষত যদি কোনো হিট শো দেখতে চাও। তা এক কাজ কোরো। সকালে নিউজ-পেপার নিউ ইয়র্কার কিনো। তাতেই চলতি থিয়েটারের লিস্ট পাবে। প্রথমে বক্স অফিসে যেও। সেখানে যদি টিকিট না পাও, তবে থিয়েটার ব্রোকারের কাছে টিকিট কিনো। টিকিটের দামের ওপরে এক ডলার পঁয়ষট্টি সেণ্ট লাগবে, আর ট্যাক্স।

তারপরেই বললো : এখানে দিন কয়েক থাকলে আমি ব্যবস্থা করে দিতে পারতাম।

কী করে ?

কনি বললো : খুব সোজা উপায়। নিউ ইয়র্কার ম্যাগাজিন দেখে বক্স অফিসে চিঠি দিতাম তিনটে তারিখ দিয়ে, আর টিকিটের দামের চেকও সঙ্গে দিয়ে দিতাম। এরই সঙ্গে একটা নিজের নাম লেখা স্ট্যাম্প লাগানো খাম দিলেই ডাকে টিকিট চলে আসত। কিন্তু তার যখন সময় নেই, তখন নিউ-ইয়র্কে গিয়েই চেষ্টা করবো।

আমি বললাম : আমাদের দেশে শুনেছি থিয়েটারের টিকিট পেতে খুব অসুবিধা নেই। তবে সিনেমার টিকিটের জন্যে লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হয়।

কনি বললো : এ দেশের লোক সিনেমা ও টেলিভিশনে ছবি দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তাই নাইট ক্লাবে ফ্লোর শোয় ব্যালে ও থিয়েটারে জীবন্ত মানুষ দেখতে বেশি ভালবাসে। তুমি শুনে আশ্চর্য হবে যে আমেরিকায় তিন হাজারেরও বেশি লিট্‌ল থিয়েটার আছে। প্রতি কলেজ

ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে থিয়েটারের দল। অন্তত দশ বারোটি শহরে পেশাদার দলের কোম্পানি আছে।

একটু থেমে বললো : আর এই ব্যাপারে আমাদের একটা বৈশিষ্ট্যের কথাও বলি। তার নাম সিম্‌ফনিক ড্রামা, মানে কবিতা গান ও নাচ দিয়ে কোনও চমকপ্রদ ঐতিহাসিক ঘটনার অভিনয়।

নিউ ইয়র্কে এ সবেরও অভিনয় হয়?

রোজ হয় না। কিন্তু নর্থ ক্যারোলিনায় গেলে দেখবার বেশি সুযোগ পাবে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম : ওয়াশিংটনে বুঝি এসব নেই?

কনি বললো : এখানে ব্যালে দেখতে পারতে। ব্যালের ভালো দলগুলি সব ওয়াশিংটন আর নিউ ইয়র্কে।

আমার কফি শেষ হয়ে গিয়েছিল। কনিও তার পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে বললো : তোমার বোধহয় ঘুমোবার সময় হয়েছে!

আমি হেসে বললাম : না।

কিন্তু কনি আর বসলো না, বললো : আবার আমাদের দেখা হবে কিনা জানিনে।

আমিও জানি না।

তবে তোমার সঙ্গে কথা বলে খুব ভালো লাগলো। আর—

বললাম : বলো।

একটু ইতস্তত করে কনি বললো : আমাদের সমাজের কথা যদি কিছু লেখো তো মেয়েদের অবস্থা তুমি নিজের চোখে দেখে যেও। নিউইয়র্কের পথেঘাটে মেয়েদের যে ছবি দেখবে, আর যে মেয়েদের দেখবে নানা জায়গায়, তারা আমেরিকার মেয়ে ভাবলে ভুল করবে।

কেন?

তারা শহরের মেয়ে। আধুনিক সভ্যতা তাদের সৃষ্টি করেছে। আমেরিকার মেয়ে দেখতে হলে তাদের নানা জায়গায় দেখতে হবে—গ্রামে ছোট শহরে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অফিসে দেশের সর্বত্র। বিজ্ঞাপন পড়ে তোমার

মনে হবে যে তারা পুরুষের ভোগের পণ্য, তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু আসলে সমাজের সর্বক্ষেত্রে তুমি মেয়েদের দেখতে পাবে পুরুষের সঙ্গে সমান ভাবে কাজ করছে। অফিসে আদালতে চিকিৎসা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এমনকি রাজনীতির ক্ষেত্রেও তুমি মেয়েদের দেখবে।

কনি উঠে দাঁড়িয়ে বললো : তোমাদের প্রধান মন্ত্রী একজন মহিলা বলে আমি এ কথা বলছি না। আমাদের মধ্যেও এমন মহিলা আছেন, যাঁদের তিনজন তিনটি স্টেটের গভর্নর, তু'জন প্রেসিডেণ্টের ক্যাবিনেট মেম্বার, আর দীর্ঘ দিন থেকে একাত্তর জন মহিলা ইউ. এস. কংগ্রেসে কাজ করছেন।

আমি একটুখানি হাসতেই কনি বললো : তোমাকে বলবার জন্যেই এই খবর আমি সংগ্রহ করেছিলাম। হাউস অফ রিপ্রেজেণ্টেটিভ্‌সেও দশ জন মহিলা আছেন, আর একজন আছেন সিনেটে। স্টেটগুলোর বিধান সভায় কম করেও তিনশো সত্তর জন মহিলা আছেন। আর বড় বড় সরকারী পদে কজন মহিলা আছেন। তার হিসেব আমার জানা নেই।

আমি বললাম : এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের মতো তোমরাও এখনও মেয়েদের ব্যাপারে পিছিয়ে আছ।

কেন ?

সমান ভাবলে এই সব হিসেব আর রাখবে না।

কনির সঙ্গে আমি হোটেল থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। এবারে জিজ্ঞাসা করলাম : তোমাকে কি আমি পৌঁছে দেবো ?

কনি হেসে বললো : মেয়ে বলে এই কথা বলছো তো ! আমি একাই যাতা-য়াত করি। ধন্যবাদ। গুড নাইট।

সহাস্যে আমি তাকে বিদায় দিলাম।

৯

পরদিন বিকেলে আমি নিউ ইয়র্কে এসে পৌঁছলাম। চার্লস বীল আমাকে ঠিকই বলেছিলেন। আগে থেকে তিনি আমার ঘরের ব্যবস্থা করে না রাখলে হোটেলে আমি জায়গা পেতাম না। সাধারণ একটা হোটেলেও

ঘরের ভাড়া অনেক। তাতে প্রাইভেট বাথ নেই। সকালের দিকে এলে জায়গাও পেতাম না। চেক-আউট টাইম এখানে বিকেলের দিকে।

ওয়াশিংটনে আমার কোনো কাজ ছিল না। কিন্তু নিউইয়র্কে একটা বক্তৃতা দিতে হবে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছু বলতে হবে ইউনিভার্সিটির ছেলেমেয়ে-দের। এর জন্যে আমার ভাবনা নেই। দেশ থেকেই কয়েকটা বিষয়ে লিখে এনেছি। সেই লেখা কাগজ পড়তে হবে। কাজেই মন মেজাজ কোনো দুর্ভাবনায় আড়ষ্ট হয়ে ছিল না। এসেই আমি শহর দেখতে বেরিয়ে পড়লাম।

মনে মনে ঠিক করেছিলাম যে কোনো যানবাহনে পয়সা খরচ করবো না। কী ভাবে শহর দেখা যায় তা হোটেলেই জেনে নিয়েছিলাম। বাসে নৌকোয় বা হেলিকপ্টারে চেপে শহর দেখবার সুব্যবস্থা আছে। বাসে শহর দেখাই সবচেয়ে নির্ঝঞ্ঝাট মনে হলো। দু ঘণ্টার ট্যুর তিন ডলারে হয়, সাড়ে তিন ডলার লাগে আড়াই ঘণ্টার ট্যুরে। আর চার ঘণ্টা ধরে শহর দেখতে হলে পৌনে পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ ডলার পর্যন্ত খরচ করতে হয়। আমি একটা আড়াই ঘণ্টার ট্যুর পেয়ে গেলাম।

হেলিকপ্টার ট্যুরও মন্দ নয়। পাঁচ ডলার দিলে নিউইয়র্ক এয়ার ওয়েজে আকাশ থেকে সমস্ত শহরটা দেখা যায়। কিন্তু হোটেলের লোক আমাকে নৌকোয় শহর দেখার পরামর্শ দিয়েছিল। বলেছিল, সবচেয়ে ভালো লাগবে নৌকোয়। আড়াই ডলারে ম্যানহাটন আইল্যাণ্ড ঘুরে দেখাবে, আর হাইড পার্কে ফ্র্যাঙ্ক্লিন রুজভেল্টের বাড়ি দেখতে হলে তো নৌকোতেই যেতে হবে।

কিন্তু এ সবের জন্যে ট্যাক্সি খরচ অতিরিক্ত আছে। বাসের জন্যে তা লাগলো না। আমেরিকায় আমার সবচেয়ে যা ভয়ের ব্যাপার, তা হলো খরচের বহর। যতক্ষণ সে ব্যাপারে অভ্যস্ত না হচ্ছি, ততক্ষণ বেশ সতর্কভাবেই চলতে হবে। এই সব দিক বিবেচনা করেই আমি বাসে উঠেছিলাম। আর বাসে চলতে চলতেই মনে হচ্ছিল যে এতেই যেন শহরটাকে বেশি ঘনিষ্ঠভাবে দেখা যাচ্ছে।

দেশে থাকতে এই শহর সম্বন্ধে যে সব কথা শুনেছিলাম, দেখলাম যে তা মিথ্যা নয়। এক একটা বাড়ি এমন ভাবে আকাশের দিকে মাথা তুলে আছে যে মনে হয় আকাশে বুঝি তাদের মাথা ঠেকে যাচ্ছে। এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং-এর কথা আগেই শুনেছিলাম—পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু বাড়ি, একশো তুই তলা। উপর থেকে চারিদিকের দৃশ্য দেখবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এ ছাড়াও এত উঁচু উঁচু বাড়ি আছে যে তার নাম করে শেষ করা যায় না। এ সব ষাট থেকে সাতাত্তর তলা বাড়ি। প্যান অ্যামেরিকান এয়ার ওয়েজের উনষাট তলা বাড়ির ছাদে হেলিকপ্টার নামবার জন্যে হেলিপোর্ট আছে। এদের নতুন অফিস হয়েছে গ্র্যাণ্ড সেণ্ট্রাল টার্মিনাল রেলওয়ে স্টেশনের মাথায়। রেলের স্টেশন যে কত বড় হতে পারে না দেখলে তা কল্পনা করা যায় না। শহরে এই রকম আকাশ ছোঁয়া বাড়ির যেন শেষ নেই।

এ ছাড়া আরও অনেক দর্শনীয় স্থান আছে। দেখার চেয়ে নামই শুনলাম বেশি জায়গার। ব্রঙ্ক্স জু, বটানিকাল গার্ডেন, সেণ্ট্রাল পার্ক, সিটি হল ডিস্ট্রিক্ট, ফলি স্কোয়ারে আদালত এলাকা, চায়না টাউন, কনি আইল্যাণ্ড, গ্রীন উইচ ভিলেজ, হেইডেন প্ল্যানেটোরিয়াম, লিঙ্কন সেণ্টার, লিট্‌ল ইটালি, রকফেলার সেণ্টার, স্ট্যাচু অফ লিবার্টি, টাইম্‌স স্কোয়ার ও ওয়াল স্ট্রীট ডিস্ট্রিক্ট, ওয়াশিংটন স্কোয়ার ও ওয়াশিংটন আর্চ। ইউনাইটেড নেশনের বাড়ি কত তলা তা বলতে পারবো না, কিন্তু তার গম্বুজওয়ালা জেনারেল অ্যাসেম্বলির বাড়িটি সাধারণ বাড়ির মতোই নিচু। নিউইয়র্ক হারবার আমার কাছে একটা বিস্ময়কর স্থান বলে মনে হলো। বিশাল আকারের কত জাহাজ যে ডকে দাঁড়িয়ে আছে, তার হিসেব নেই। শুনলাম যে এ-দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের ছত্রিশ পার্সেণ্ট মূল্যের জিনিষ এই বন্দরেই ওঠানামা করে।

এ সবের একটা মোটামুটি ধারণা হবার পর আমি চৌত্রিশ নম্বরের রাস্তায় চলে এলাম। সেভেন্‌থ অ্যাভিনিউ থেকে ফিফ্‌থ অ্যাভিনিউ পর্যন্ত নিউ-ইয়র্কের প্রধান দোকানপাট। এখানে আসবার কারণ ছিল। কিছু কেনবার

কথা আমি ভাবি নি, আমি ভেবেছিলাম বিজ্ঞাপন দেখার কথা। ওয়াশিং-টনে কনি আমাকে যে সব কথা বলেছিল, তা কতটা সত্য আমার জানা উচিত। এই কৌতূহলেই আমি এখানে এলাম।

অলস ভাবে অগ্রসর হয়ে দেখলাম যে কনি আমাকে সত্য কথাই বলেছে। নারীর দেহ নিয়ে এমন সব বিজ্ঞাপন আছে যে তাকাতে লজ্জা করে। অথচ এখানকার মহিলারা অত্যন্ত সহজ ভাবেই চলাফেরা করছেন। কেউ যে ভ্রূক্ষেপ করছেন তা মনে হয় না, অর্থাৎ তাঁরা এ সম্বন্ধে সচেতন নন। কিন্তু পুরুষরা এক নজরে বিজ্ঞাপনটা ঠিকই দেখে নিচ্ছেন। একা হলে দাঁড়িয়ে দেখে যাচ্ছেনও অনেকে। আর কেউ তাঁকে লক্ষ্য করছেন কিনা তার পরোয়া করছেন না।

হঠাৎ আমি একজন পুরুষকে দেখলাম তাঁর সঙ্গিনীর হাত টেনে ধরে একটা বিজ্ঞাপন দেখালেন। তারপর দু'জনেই হাসলেন একটুখানি। বেশ অর্থপূর্ণ হাসি। তার মানে, তাঁরা উভয়েই এই বিজ্ঞাপনটি বেশ উপভোগ করেছেন।

নিজের অজ্ঞাতসারেই আমি এঁদের অনুসরণ করলাম। কিন্তু তাঁরা একটা ট্যাক্সি ডেকে উঠে পড়লেন। তার সেই ট্যাক্সি চলে যাবার পরে আমি বুঝতে পারলাম যে এক অকারণ কৌতূহলে আমি তাঁদের পেছনে চল-ছিলাম।

কলকাতার চৌরঙ্গীতে দাঁড়িয়ে যেমন কলকাতার সম্বন্ধে ধারণা হয়, তেমনি নিউ ইয়র্কের এই বিপনিবহুল রাজপথে দাঁড়িয়ে আমি আমেরিকাকে জানবার চেষ্টা করলাম। এ রকম জানা যে কত অসার্থক তা সহজেই উপলব্ধি করি।

আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটন দেখবার পরে আমি কি স্বপ্নেও ভেবে-ছিলাম যে সেই আধুনিক শহরেও আছে বস্তি এলাকা! আর এ দেশের সরকারও বস্তি উন্নয়নের জন্যে আমাদের কলকাতার মতোই চেষ্টা করছেন। নিতান্ত সৌভাগ্যক্রমে সংবাদপত্রের একটা ছবি আমার চোখে পড়েছিল। একটা বস্তি এলাকার ছবি। তারই পাশে সরকারী বাড়ি তৈরি হয়েছে

বস্তি উচ্ছেদের জন্যে। কিন্তু যত বড় বস্তি, সে তুলনায় সরকারী বাড়ির সংখ্যা নিতান্তই কম। তার মানে কিছু লোক বস্তি ছেড়ে নতুন বাড়িতে উঠে গেলেও বস্তি উঠে যাবে না। দেশের রাজধানীর ছবি যদি এই রকম হয় তো নিউইয়র্কের কোথায় কী আছে তা এখানে দাঁড়িয়ে কল্পনাও করা সম্ভব নয়। তবু আমি এই দিনের আলোর মতো উজ্জ্বল রাজপথে দাঁড়িয়ে আমেরিকার শৌখিন জীবনযাত্রার এক প্রাণবন্ত প্রবাহকে অনেকক্ষণ ধরে প্রত্যক্ষ করলাম।

রাত বেশি হয় নি। কিন্তু এ দেশে ডিনারের সময়ের কথা আমার মনে পড়ে গেল। অনেকক্ষণ আগেই কক্‌টেল আওয়ার শেষ হয়ে গিয়েছিল। এই সময়ে কী হয় তা জানবার একটা কৌতূহল ছিল। কিন্তু ভয় ছিল কক্‌টেলের। মদের আস্বাদ আমার জানা নেই, মাতাল দেখে মদের সম্বন্ধে একটা প্রচণ্ড ভয় আছে। পাঁচমিশেলি মদকেই কক্‌টেল বলে শুনেছি। তাই কক্‌টেল আওয়ারে মদ ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় কিনা জানি না বলেই কোনো জায়গায় ঢোকবার সাহস পাই নি। সন্ধ্যার সময়েই এই জনপ্রিয় সময় শেষ হয়ে ডিনারের সময় আরম্ভ হয়েছিল। ডিনারের জন্য দেখলাম যে সাতটাতেই ভিড় হয় সবচেয়ে বেশি, আর আটটার পর থেকেই রেস্তোরাঁগুলি বন্ধ হতে শুরু করে। শুধু কয়েকটি বড় রেস্তোরাঁ খোলা থাকবে আটটার পরেও। সে সময় নাইট ক্লাবগুলি জমে উঠবে। নাচ গান আর ফ্লোর শো। নিজে নাচো, অন্যের নাচ দেখো, নাচ দেখো ক্যাবারে মেয়েদের—নানা রঙের। মদের নেশার সঙ্গে সেই সব নগ্নপ্রায় নাচ দেখে চোখের রঙ মনে পৌঁছবে। পাশে একটি সঙ্গী পেলে সার্থক মনে হবে জীবন।

এ পথ সে পথ ঘুরে কখন আমি একটা রেস্তোরাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলাম তা খেয়াল করি নি। হঠাৎ আমার সামনে দু'জনকে বেরিয়ে আসতে দেখে আমি থমকে দাঁড়ালাম। পুরুষটি আমেরিকান, কিন্তু মেয়েটিকে এ দেশের বলে মনে হলো না। গায়ের রঙ এ দেশের মেয়ের মতো ফর্সা নয়। কিন্তু পোশাক ও প্রসাধন দেখে চেনবার উপায় নেই।

পুরুষটি তার হাত টেনে ধরে বললো : চলো আমার অ্যাপার্টমেণ্টে।
মেয়েটি বললো : তাহলে কি তুমি আমাকে রাতে ফিরতে দেবে! কিছুতেই দেবে না।
তার তো দরকার নেই!
মেয়েটি প্রতিবাদ করে বললো : আছে।
কী দরকার?
বলে মেয়েটির মুখের দিকে তাকালো তার সঙ্গী।
মেয়েটি বললো : কাল সকালে আমি এই ইভনিং ড্রেসে বেরোব কেমন করে!
তবে তোমার হোটেলেই চলো আগে।
বলে একটা ট্যাক্সি ধরে তারা চলে গেল।
আমার চোখের সামনে ঘটলো এই ঘটনা। আমি বোধহয় একটু পরেই সব ভুলে যেতাম, কিন্তু তার উপায় রইলো না। এর পরের ঘটনা আমার স্বপ্নেরও অতীত ছিল। মনে হচ্ছে তা না দেখলেই যেন ভালো হতো। বাইরে বসে অভিনয় দেখা ভালো, তার ভিতরের অন্ধকারকে অন্ধকারেই থাকতে দিতে হয়।
উদ্দেশ্যহীনভাবে পথ চলতে চলতে আমি একটা ছোট রেস্তোরাঁয় রাতের আহার সেরে নিয়েছিলাম। পথে পথে আর ঘুরে না বেড়িয়ে আমি ফিরে এলাম নিজের হোটেলে। ফিরেই শুনলাম যে একটি বাঙালী ছেলে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। তার সঙ্গে আরও দু'জন এ দেশের ছেলে আছে। তারা পড়ে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে।
আলাপ হলো। ভারি ভালো লাগলো এই ছেলে তিনটিকে। আমার লেখা নিয়েই আলোচনা করলো খানিকক্ষণ। আমেরিকান ছেলে দুটিও আমার লেখা পড়েছে শুনে খুবই আশ্চর্য হলাম। তাদের একজন বললো, এদেশের সতেরোটা লাইব্রেরিতে ভালো বাঙলা বই আছে। বাঙলা শিখে আমরা সেই সব বই পড়ি।
অনেক বাঙালী লেখকের লেখা বই তারা পড়েছে শুনে খুব ভালো লাগলো।

বেশ গর্ববোধ হলো তাদের মন্তব্য শুনে। কোথায় আমাদের বাঙলা, আর সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে কোথায় এই আমেরিকা! এখানেও যে আমাদের কিছু বই স্থান পেয়েছে, এ আমাদের গর্বেরই কথা।

ছেলে তিনটি তাদের রাতের আহার সেরে এসেছিল বলে তাদের ফেরার বিশেষ তাড়া ছিল না। আমি তাদের কফি খাওয়ালাম। বাঙালী ছেলেটি উচ্ছ্বসিত ভাবে কথা বলছিল। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো : তোতাদি!

আর এই ডাক শুনে ফিরে তাকিয়েই আমি দেখলাম সেই মেয়েটিকে। একটু আগে রেস্তোরাঁ থেকে সেই বেরিয়েছিল একজন আমেরিকানের সঙ্গে। কিন্তু এখন সে আর বিদেশী পোশাকে নেই, ঝকঝকে শাড়ি পরেছে একখানা। আর সেই পুরুষটিও আছে পাশে। অন্তরঙ্গ ভাবে কথা বলতে বলতেই আসছিল দু'জনে। চোখে খানিকটা বিরক্তি নিয়ে মেয়েটি আমাদের দিকে তাকালো।

আমার পাশের বাঙালী ছেলেটি উঠে দাঁড়িয়েছিল, কেমন একটু অপ্রস্তুত ভাবে বসে পড়লো। কিন্তু তোতাদি সহজ ভাবে বললো : আসছি।

পরিষ্কার বাঙলা কথা। আমেরিকায় শেখা বাঙলা নয়, এ একেবারে বাঙালীর বাঙলা কথা। এই বাঙলা শুনে বাঙালী নয় বলে কোনো সন্দেহ হবে না।

হোটেল থেকে দু'জনে বেরিয়ে যাবার পরে আমি বাঙালী ছেলেটির মুখের দিকে তাকালাম। আমার নির্বাক প্রশ্ন বুঝতে পেরে সে আমাকে মেয়েটির পরিচয় দিলো। যাঁর মেয়ে, তাঁকে আমরা অনেকেই চিনি। তিনি একজন মান্য লোক, তাই তাঁর নাম উল্লেখ করা উচিত হবে না।

আমি আশ্চর্য হয়েছি দেখে ছেলেটি বললো : তোতাদি এখানে পড়তে এসেছিল।

এখন?

এখন কী করছে জানি না।

তোতাদির জন্যে আমরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম। কিন্তু সে ফিরলো না। আমি জানতাম যে সে আজ রাতে ফিরবে না। কিন্তু ছেলেটির

মুখের দিকে চেয়ে এ কথা আমি বলতে পারলাম না। বলা যায় না।

হোটেলের লাউঞ্জে বসে নিউইয়র্কের বাতি আর দেখতে পাচ্ছি না। দেখছি একটা অন্ধকার দৃশ্য। কনি বোধহয় ওয়াশিংটনে আমাকে এই কথাই বলতে চেয়েছিল।

১০

আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণা ছিল না। বই পড়ে কোনো ধারণা করা সম্ভব নয়। নিজের চোখে দেখলেও পুরোপুরি ধারণা হয় না। আর যা দেখা যায়, তাও বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়।

আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয় বলতে আমরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বুঝি। এ একটা কলেজের মতো ব্যাপার। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দেখে যে ধারণা হয়, তা নিতান্তই ভুল ধারণা। এর চেয়ে কাশীর বিশ্ববিদ্যালয় অনেক পরিমাণে বিশ্ববিদ্যালয় নামের যোগ্য। শহরের উপকণ্ঠে একটা বিরাট এলাকা জুড়ে নানা বিভাগের কলেজ, ছাত্রাবাস, হাসপাতাল, মন্দির, খেলাধূলোর জায়গা ইত্যাদি।

আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় বললে একটি ছোটখাটো শহর বুঝতে হবে। এখানে যারা থাকে, তাদের কোনো কারণেই শহরে যাবার প্রয়োজন নেই। শহরের সমস্ত সুবিধা সেখানেই পাওয়া যায়।

আর একটা অভিজ্ঞতা হয় সেখানে। শহরের নরনারী দেখে তাদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে যে ধারণা হয়, তা পালটে যেতে বেশি সময় লাগে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা যেন অন্য দেশের মানুষ। ছেলে ও মেয়ের পার্থক্য সহজে বোঝা যায় না, এমনি সহজ স্বাভাবিক তাদের জীবনযাত্রা। কোনো চপলতা নেই, কোনো উচ্ছৃঙ্খলতা নেই। নেই কোনো অভব্য আচরণ। নিজেদের পড়াশুনো নিয়েই সবাই মেতে আছে।

তাদের পোশাক-আশাকও আশ্চর্য রকমের সরল ও অনাড়ম্বর। প্রসাধন কারও দেখতে পাওয়া যায় না, নিজেকে আকর্ষণীয় করে তুলবার কারও

কোনো চেষ্টা নেই। সবাই পড়তে এসেছে, পড়াই তাদের একমাত্র কাজ। ছেলেমেয়েদের ডেটিং নিয়ে অনেক কথা শুনেছি। তেরো বছরে পা দিয়েই নাকি মেয়েরা বয় ফ্রেণ্ড খোঁজে, আর ছেলেরাও ঘুরঘুর করে গার্ল ফ্রেণ্ডের জন্য। কথাটা কতটা সত্য, তা জানবার আমি কোনো সুযোগ পেলাম না। সে রকমের ছাত্রছাত্রী আমি একটিও দেখলাম না।

যারা আমার কাছে এলো, তারা সবাই ভারতবর্ষ সম্বন্ধেই কৌতূহলী। তাদের নানা রকমের প্রশ্ন। অনেক অদ্ভুত ধারণা আছে তাদের, অনেক ভুল ধারণা। তার জন্য তাদের দোষ দেওয়া যায় না। তার কারণ আমরা এই সব ধারণা দূর করার জন্য কোনো চেষ্টা করি নি। আমাদের প্রচারকার্য মোটেই প্রশংসনীয় নয়।

দেশে থাকতে আমি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম শুনেছিলাম। খুব প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় বলে জানি। কিন্তু তার অবস্থান সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণা ছিল না। আমেরিকায় এসেই জানলাম যে এই বিশ্ববিদ্যালয় কেম্ব্রিজে। ইংলণ্ডের কেম্ব্রিজ নয়, বোস্টন শহরের নিকটে এই কেম্ব্রিজ। ইংরেজরা আমেরিকায় এসে আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে নানা জায়গায় বসবাস ক'রে ইংলণ্ডের অনেক জায়গার নাম রেখেছে। নিউ ইংলণ্ড, নিউ ইয়র্ক, কেম্ব্রিজ ইত্যাদি। ফরাসীরাও তেমনি নাম রেখেছে নিউ অর্লিয়ঁ। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার যে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৬৩৬ খ্রীস্টাব্দে। তিনশো বছরেরও বেশি পুরাতন এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানকার বড় বড় লাইব্রেরি, লা কর্বুসিয়র আর্ট বিল্ডিং আর তিনটে মিউজিয়ম ঘুরে ঘুরে দেখবার মতো। লংফেলো হাউসও জনসাধারণ দেখতে পারে। আমেরিকায় এলে এই রকমের একটা বিশ্ববিদ্যালয় না দেখলে আমেরিকা দেখা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

এক সময় একটি ছেলে আমার কাছে এগিয়ে এসেছিল। রোগা লম্বা চেহারা, মাথার চুল সব এলোমেলো। আমেরিকান ছেলেমেয়েদের মতোই জামাকাপড় সম্বন্ধে একটু বেশি উদাসীন। প্রথমটায় আমি বুঝতে পারি নি

যে সে বাঙালী। তাই পরিষ্কার বাংলায় যখন কথা বললো, তখন বেশ আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। সে বলেছিল : আপনি এখান থেকে কোথায় যাবেন ?

আমি তার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে দেখে আমার পরবর্তী জায়গার নাম বললাম।

সে বললো : এদিকের আর কোনো শহর আপনি দেখে যাবেন না ?

বললাম : কোনো শহর দেখে দেশটাকে তো চেনা যায় না, তাই শহর দেখার আগ্রহ তেমন নেই।

ছেলেটি চুপ করে রইলো দেখে বললাম : কেন, তোমার মত কি অন্য রকম ?

না, মানে—

তোমার নাম কী ?

রবি।

বললাম : কোনো সঙ্কোচের দরকার নেই, নিজের মত তুমি স্পষ্ট করেই বলতে পার।

এইবারে রবি স্পষ্ট করে বললো : আমাদের কলকাতার কাছেই আছে হিন্দ মোটর। সেই কারখানা দেখে আমাদের মোটর তৈরির কারখানার ধারণা। আমার এক বন্ধু যদি আমাকে ডেট্রয়েটে টেনে নিয়ে না যেত, তাহলে মোটর তৈরির কারখানার সম্বন্ধে আমার একটা ভুল ধারণা চিরকাল থেকে যেত।

সত্যি !

উৎসাহ পেয়ে রবি বললো : ডেট্রয়েট নদীর তীরে এটি মোটর কারখানারই শহর। কারখানা দেখবার জন্যে কণ্ডাক্টেড ট্যুর আছে। দু স্কোয়ার মাইল জায়গা জুড়ে ফোর্ড রিভার রুজ প্ল্যান্ট। প্লি মাউথের অ্যাসেম্‌ব্লি লাইনই পৃথিবীতে সবচেয়ে বড়। এ ছাড়াও আছে ক্যাডিলাক, ক্রাইস্‌লার, ডজ, ডিসোটো, পন্টিয়াক, ফোর্ড, লিঙ্কন-মার্কারি প্রভৃতি গাড়ির অ্যাসেম্‌ব্লি লাইন। তারপর ফোর্ড রোটাণ্ডা হেনরি ফোর্ড মিউজিয়াম—এ সবও

দেখবার মতো।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে পায়ে হেঁটেই চলাফেরা করতে হয়। রবি আমার সঙ্গে সমানে পা ফেলে চলতে চলতে বললো : এদেশে যখন এসেছেন, তখন আমেরিকার দ্বিতীয় শহর শিকাগোও দেখে যাবেন। খুব কাছাকাছি এই দুটি শহর।

শিকাগোর নামে স্বামী বিবেকানন্দর দিগ্বিজয়ের কথা আমার মনে পড়ে গেল। তিনি এই শহরে এসেছিলেন বিশ্বের ধর্মসভায় যোগ দিতে— পার্লামেণ্ট অফ রিলিজিয়ন্স। তাঁর বক্তৃতা শুনে মোহিত হয়েছিল এ-দেশের লোক। হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা তিনি প্রমাণ করেছিলেন। সমবেত শ্রোতাদের তিনি ভাই বোন বলে সম্বোধন করে তিনি বলেছিলেন, নদী যেমন নানা ধারায় প্রবাহিত হয় সমুদ্রের দিকে, তেমনি, হে প্রভু, বিচিত্র রুচির সরল ও কুটিল মানুষের তুমিই একমাত্র গন্তব্য স্থল। গীতায় আমাদের কৃষ্ণ বলেছেন, যে যেভাবে আমার উপাসনা করবে, আমি সেই ভাবেই তার কাছে প্রকাশিত হই। দৃঢ় কণ্ঠে স্বামীজী এই সভায় ঘোষণা করেছিলেন, সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি ও ধর্মান্ধতার মৃত্যুকাল আসন্ন। স্বামীজীর যে জীবনী লিখেছিলেন রোমা রোলাঁ, তাতে বলেছেন যে এই সভায় সবাই বলেছিলেন নিজ নিজ ভগবানের কথা। একমাত্র বিবেকানন্দই বলেছিলেন সকলের ভগবানের কথা। তাই এই বিশ্বধর্ম-সম্মেলন তাকেই জানালেন শ্রেষ্ঠ বক্তার অভিনন্দন।

স্বামীজীর স্মৃতিতে উজ্জ্বল এই শিকাগো শহরটি দেখবার জন্যে মন আমার উন্মুখ হলো। কিন্তু আমার ইটিনেরারিতে এর নাম ছিল না। ছেলেবেলায় আমরা যে মানচিত্র দেখেছিলাম তাতে দূরত্বের হিসেব নেই। কিন্তু মনে আছে যে ক্যানাডা ও ইউনাইটেড স্টেট্‌সের সীমানায় আছে মিচিগান, এরি, অণ্টারিও প্রভৃতি নামের কয়েকটি বড় বড় হ্রদ। তারই ধারে বা আশেপাশে গড়ে উঠেছে অনেকগুলি বড় শহর বা বন্দর। তার সঠিক ধারণা না থাকলেও বুঝতে পেরেছিলাম যে এই অঞ্চলটাই রবি আমাকে দেখতে বলছে। কিন্তু আমি কোনো কথা না বললেও সে থামলো না, বললো :

মিচিগান অ্যাভেনিউএ একবার দাঁড়ালেই বুঝতে পারবেন যে শহরটা কত বড়। বাড়িগুলো সব নিউ ইয়র্কের মতোই আকাশ ছোঁয়া। সামান্য কিছু দিলেই কয়েকটা বাড়ির মাথায় উঠে শহর দেখা যায়। কোনো বাড়ির ছাদে উঠে এই শহর দেখে মনে হবে যে এরোপ্লেন থেকে শহর দেখছি। অদ্ভুত অভিজ্ঞতা।

রবি এমন ভাবে এই সব বলতে লাগলো যেন আমার সম্মতি পেলেই সে নিজেই আমাকে এই শহরগুলো দেখিয়ে আনবে। কিন্তু তাকে কোনো আগ্রহ দেখাতে আমার ভয় হলো। তাই নিঃশব্দেই আমি তার সঙ্গে চলতে লাগলাম।

রবি আমার মুখের দিকে তাকালো দু একবার। তারপর কিছু বিমর্ষভাবে বললো : জানেন। এ দেশে আমাদের বড় বদনাম।

কেন ?

বলে আমি তার মুখের দিকে তাকালাম।

রবি বললো : আমাদের মানে আমি শুধু বাঙালীদের কথাই বলছি না, সমস্ত ভারতীয় ছেলেমেয়েদেরই প্রায় একই রকমের দুর্নাম।

এবারে আমি আর কোনো প্রশ্ন করলাম না।

রবি নিজেই বললো : আমরা মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করে এ দেশে আসবার সুযোগ পেয়েছি স্কলারশিপ পেয়ে। আমার বাবা কোনো রকমে একখানা প্লেনের টিকিট কিনে দিয়েছিলেন। আমি ভালো ভাবে পাশ করে ফিরে গেলে বা এখান থেকে টাকা পাঠালে আমাদের সংসারে একটু সচ্ছলতা আসবে। তাই লেখাপড়ার কথা ছাড়া অন্য কথা আমি ভাবতে পারি না।

তারপর একটু থেমে বললো : আমার মতো অবস্থার ছেলে আরও আছে জানি, কিন্তু তাদের সঙ্গে কচিৎ দেখা হয়। এ দেশের ছেলেমেয়েরা তাদের চেনেই না। যাদের আমরা সব সময়ে দেখতে পাই, তারা বড়লোকের ছেলেমেয়ে। তারা স্কলারশিপও পায়, দেশ থেকেও তাদের পয়সা আসে।

দেশ থেকে !

রবি বললো : হ্যাঁ। সেদিন একটি ছেলে বললো, তার বাবা দেশে একটা জায়গায় টাকা জমা করেন, আর ছেলেটা এখান থেকে টাকা পায়। বোধহয় কোনো ভারতীয় চাকুরের সঙ্গে এই ব্যবস্থা। টাকাটা ভারতবর্ষে তাঁর পরিবারকে দিতে হয়, কিংবা তার ব্যাঙ্কে, আর তিনি সেই ছেলেটিকে টাকা দেন।

এর জন্যে তার বদনাম কেন?

অত টাকা তো ওর লাগে না, ফুর্তি করেই খরচ করে। আপনি বিশ্বাস করবেন না, এ দেশের মেয়েগুলো যেন ফুর্তি করবার জন্যেই জন্মেছে। সারাক্ষণ ছেলেদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করছে।

তার রাগ দেখে আমি হেসে ফেললাম।

কিন্তু রবি আমার হাসি দেখে আরও রেগে গেল। বললো: আপনি হাসছেন! আমাদের যে কত বদনাম হচ্ছে আপনি জানেন না। এ দেশের একটা বাজে মেয়ের জন্যে—

বলেই রবি থেমে গেল।

আর আমি বললাম : বুঝেছি।

আমার তাই কী ইচ্ছা করে জানেন?

বলে আমার মুখের দিকে তাকালো। তারপর আমার কৌতূহল লক্ষ্য করে বললো : আমার ইচ্ছে করে, এ দেশে এমন কোনো কাজ করি যে ভারতীয় বলে এরা যেন আর আমাদের উপেক্ষা না করে।

আমি বললাম : আমাদের দেশের মানুষ তো এখানে নোবেল পুরস্কার পেলেন! এর চেয়ে বড় কাজ আর কী করতে পারবে!

রবি তৎপর ভাবে বললো : নোবেল প্রাইজ নয়। এরা আমাদের ভারি ভীরু ভাবে। ভাবে আমরা ফুর্তি করতেই এ দেশে আসি।

আমি বললাম : এ দুর্নাম কি একা ঘোচানো যায়?

তেমন কিছু করতে পারলে নিশ্চয়ই যায়। যায় না?

রবি যে আমাকে তাদের ক্যান্টিনে টেনে এনেছিল তা বুঝতে পারলাম তার পরের কথা শুনে। বললো : একটু দাঁড়ান, আমি আপনার জন্যে কফি

নিয়ে আসি।

বলেই ক্যান্টিনের কাউন্টার থেকে কাগজের কাপে কফি নিয়ে এলো। একটা কাপ আমার হাতে দিয়ে বললো : এইখানেই বসুন। বসে বসেই কফিটা খাওয়া যাক।

দেখলাম যে অনেক ছেলেমেয়ে রোদে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে কিছু খাচ্ছে। কেউ পড়ছে, কেউ গল্প করছে সঙ্গীর সঙ্গে, কেউ মাটির ওপর ক্লান্ত ভাবে শুয়েও আছে। রবিকে বসতে দেখে আমিও বসে পড়লাম। আর কফিব কাপে চুমুক দিলাম।

রবি একবার অন্য ধারে চেয়ে দেখলো। তারপর বললো : আমি কী ভেবেছি জানেন ?

আমি তার দৃষ্টি অনুসরণ করে একটা মেয়েকে এসে কাছাকাছি বসতে দেখলাম ? এ দেশেরই একটি সুশ্রী মেয়ে। তারপরে বললাম : বলো।

রবি সগর্বে বললো : নায়েগ্রা প্রপাতের ওপর থেকে আমি লাফিয়ে পড়ব। আমি আঁতকে উঠলাম তার কথা শুনে। এ যে নিউ ইয়র্কের একশো দু-তলা এম্পায়ার বিল্ডিং থেকে লাফিয়ে পড়ার মতো! নিচে পড়ার পর শরীরের আর কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে কি!

রবি বললো : আপনি ভয় পাচ্ছেন নাকি!

বলে সেই মেয়েটির দিকে তাকালো।

বললাম : ভয় পাবার মতোই কথা যে!

রবি বললো : ভয় পাবাব কিছু নেই। আমি সব দেখে শুনে এসেছি। ওপর থেকে দেখেছি। দেখেছি নিচে থেকেও। একটা চওড়া নদী বয়ে আসতে আসতে হঠাৎ পনের ষোল তলার মতো নিচে গড়িয়ে পড়েছে। নিচেও তো জল! জলের ওপরে পড়লে ভয়ের আর কী আছে!

বললাম : ভয়ের কিছু না থাকলে কি আর এ দেশের লোক লাফালাফি করতো না!

রবি বললো : ভয়েই কেউ লাফায় না। আর সবাইকে জানিয়ে একটা লাফ দিলেই ভারতীয়দের ভীরু নাম চিরদিনের জন্যে ঘুচে যাবে।

বললাম : তা যাবে না।

কেন?

নিন্দুকেরা বলবে, ছেলেটার মাথা খারাপ ছিল, তাই ভয় পায় নি।

রবি আমার কথা শুনে খুব দমে গেল। খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললো : আপনি নায়েগ্রা দেখেছেন?

বললাম : না।

সত্যি দেখেন নি?

সত্যিই দেখি নি।

রবি বললো : সেকি! এখান থেকে তো মোটেই দূরে নয়। চলুন না, কাল আমরা দেখে আসি! বাসেই যাতায়াত করা যাবে।

তাই নাকি!

বলতেই রবি সোৎসাহে বললো : আমরা তো মাঝে মাঝেই বেড়াতে যাই। কিছুদিন আগে একটা ছোট ছেলে নদীতে নৌকো উল্টে পড়ে গিয়েছিল, তারপর স্রোতের টানে একেবারে নিচে। কিছু হয় নি ছেলেটার। চলুন না কাল, আপনাকে আমি সব দেখিয়ে দেবো।

একদিন নয়। দুটো দিন আমার অবসর ছিল। তাই তার প্রস্তাবে আমি রাজী হয়ে গেলাম। বললাম : দু'জনের খরচই আমি দেবো।

রবি আপত্তি করে বললো : না, তা হয় না। আমি আমার নিজের খরচেই যাব।

কফি আমাদের শেষ হয়ে গিয়েছিল। রবি বললো : আপনি তাহলে বিশ্রাম করুন। আমি সব ব্যবস্থা করে এসে আপনাকে খবর দেবো।

১১

নায়েগ্রা জলপ্রপাতের কথা আমি ছেলেবেলায় ভূগোলের বইএ পড়েছিলাম। জলপ্রপাত বলতে আমরা গিরিডির উশ্রী বা রাঁচীর হুড্রো প্রপাত বুঝি, কিংবা শিলঙের বিশপ ফল্‌স বা দার্জিলিঙ পাহাড়ের পাগলা

ঝোরা। অনেকে হয়তো কর্ণাটক রাজ্যের জের সোপ্পা বা জোগ ফল্‌স দেখেছেন। কিন্তু নায়েগ্রা কী জিনিস তা না দেখলে কল্পনা করা যায় না। নায়েগ্রা দেখতে এসে এই কথাই আমার মনে এলো সবার আগে।

জব্বলপুরে আমি নর্মদার জলপ্রপাত দেখেছি। উপত্যকার উপর দিয়ে ঝিরঝির করে বইছে নর্মদা নদী। কিন্তু গোটা নদীটা গড়িয়ে পড়ে নি, নদীর একটা অংশ জলপ্রপাত হয়ে নিচে পড়ছে। বাকি অংশটা সংকীর্ণ হয়ে জলপ্রপাতের মূল ধারার সঙ্গে মিলেছে উপত্যকার উপরেই। সে ভারি সুন্দর দৃশ্য, কিন্তু এমন কোনো অভাবনীয় দৃশ্য নয়। নায়েগ্রা দেখার পর পৃথিবীতে আব কোনো জলপ্রপাত দেখার বাসনা বোধহয় থাকে না।

অসংখ্য দর্শক এখানে প্রতিদিন যাতায়াত করে। হাঁটতে হাঁটতেই একে-বারে নদীর ধার পর্যন্ত তারা চলে যায়। আমরাও এগিয়ে চললাম।

রবি বললো : শুনেছি, এই নায়েগ্রা দেখতে বছরে পাঁচ কোটি লোক আসে।

পাঁচ কোটি!

রবি বললো : আমরা ভাবতে পারি না।

তারপরে আরও অনেক খবর দিলো। এখানে দুটি জলপ্রপাত আছে—একটির নাম হর্স শু ফল্‌স, আর একটিকে বলে আমেরিকান ফল্‌স। লেক এরি ও অন্টারিওকে যুক্ত করে প্রবাহিত হচ্ছে নায়েগ্রা নদী পূর্ব থেকে পশ্চিমে। নদীর এক ধারে ইউনাইটেড স্টেট্‌স, অন্যধারে ক্যানাডা। দুই দেশের মাঝখানে এই নদী। নদীর মাঝ বরাবর এই দুই দেশের সীমানা।

একখানা মানচিত্র দেখবার পরে জিনিসটা আরও পরিষ্কার হয়ে গেল। প্রশস্ত নায়েগ্রা নদী পূর্ব থেকে পশ্চিমে আসতে আসতে হঠাৎ উত্তরবাহিনী হয়েছে। গোট আইল্যাণ্ড নামে একটি দ্বীপের সৃষ্টি করে দু'ধার দিয়ে প্রবাহিত হতে গিয়েই দুটি জলধারা গড়িয়ে পড়েছে নিচে। আমেরিকার দিকের ধারার নাম আমেরিকান ফল্‌স, আর ক্যানাডার দিকের নাম হর্স শু ফল্‌স। গোট আইল্যাণ্ড আমেরিকার জমি, ফল্‌স দুটিও আমেরিকার।

নিচে পড়েই এই প্রপাত দুটি মিলিত ধারায় উত্তরবাহিনী হয়েছে। পূর্বে আমেরিকা আর পশ্চিমে ক্যানাডা। যে পাওয়ার প্রজেক্ট তৈরি হয়েছে, দুটো দেশই তার ভোগের অধিকারী।

আমেরিকার ফল্‌স এক হাজার ষাট ফুট প্রশস্ত, উঁচু একশো চুরাশি ফুট। গ্রীষ্মকালে উপরের নদীর জল মাত্র দেড় ফুট গভীর থাকে। এর তুলনায় হর্স শু ফল্‌স অনেক সুন্দর। চওড়ায় এটি দু হাজার দুশো ফুট, উঁচু একশো ছিয়াত্তর ফুট, আর উপরে নদীর জলের গভীরতা গ্রীষ্মকালে থাকে ছ ফুট। নিচের জল একশো আশি ফুট গভীর। এই দুটি জলপ্রপাতকে আমরা সাধারণ ভাবে নায়েগ্রা ফল্‌স বলি। যে জায়গায় আমরা এসে থেমেছি, তার নাম সিটি অফ নায়েগ্রা ফল্‌স।

রবি বললো : ক্যানাডার দিক থেকে কুড়িটা সার্চ লাইট জ্বলে রাতে, দিনের মতো আলো হয়ে যায় চারিদিক। কত আলো জানেন?

বললাম : না।

চার বিলিয়ান ক্যাণ্ড্‌ল পাওয়ার।

আমরা একশো দুশো ক্যাণ্ড্‌ল পাওয়ার বুঝি। চার বিলিয়ান অর্থাৎ চল্লিশ কোটি ক্যাণ্ড্‌ল পাওয়ারের কোনো ধারণা আমাদের নেই। রাতে একটা জলপ্রপাত দেখবার জন্যে এত বিদ্যুৎ খরচ আমরা ভাবতেও পারি না।

রবি বললো : কয়েক বছর আগে এখানে নাকি একটা অভাবনীয় কাজ হয়। দুবার এই জায়গায় খুব বড় রকমের ল্যাণ্ড স্লাইড হয়েছিল। সবাই ভয় পেয়েছিল যে নায়েগ্রার রূপ একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। দেশে নাকি খুব হুলুস্থুল হয়। তারপর এই আমেরিকান ফল্‌সের জল বন্ধ করে নিচের বড় বড় পাথর পরিষ্কার করা হয়। আর বাফার ড্যাম নামে একটা ড্যামও তৈরি হয়েছে। দুই দেশ মিলে এই কাজ করেছে নায়েগ্রাকে রক্ষা করবার জন্য।

দু চোখ ভরে আমরা নায়েগ্রার রূপ দেখলাম। উপর থেকে, নিচে থেকেও। যেমন সুন্দর, তেমনি ভয়ঙ্করও। দেখতে দেখতেই রবি বললো : ঐ ওপর থেকে যদি একবার লাফিয়ে পড়তে পারি তো ভারতীয়দের ভীরু নাম

আর থাকবে না।

সভয়ে আমি বললাম : এমন পাগলামি কোরো না।

আপনিও ভয় পাচ্ছেন!

বলে রবি আমার দিকে তাকালো করুণভাবে। তারপরে বললো : আসু[n]
এই দিকে।

কেন জানি না, আমার মনে হলো যে রবি আমার কথা শুনে দমে যায় নি
আমি হয়তো তার একটি দুর্বলতার স্থানে আঘাত দিয়ে ফেলেছি অজ্ঞাত
সারে। কিন্তু সহসা রবিকে ত্রস্ত পদে হাঁটতে দেখে আমার অন্য সন্দে
হলো। আমি চারিদিকে চেয়ে কারণটা অনুমান করবার চেষ্টা করলাম।
হঠাৎ মনে হলো যে ভিড়ের মধ্যে আমি একটি পরিচিত মুখ দেখ
পেয়েছি। এ দেশের একটি মেয়ের মুখ। এ মুখ আমি কোথায় দেখে
ভাবতে গিয়েই মনে পড়লো যে গতকাল বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় দেখে
তাকে। রবির সঙ্গে মাটিতে বসে আমি যখন কফি খাচ্ছিলাম, তখন এ
মেয়েটি শ্যেন দৃষ্টিতে আমাদের লক্ষ্য করছিল। তারপরে বোধহয় আম
দের অনুসরণও করেছিল খানিকটা পথ। কখন থেকে আমাদের লক্ষ
করছিল, তা জানতে পারি নি। কেন এমন করছিল, তাও জানবার চেষ্
করি নি।

আমি রবির মুখের দিকে তাকালাম। কিন্তু রবি কোনো দিকে তাকাল
না। হনহন করে এগিয়ে চললো।

চলতে চলতেই আমি জিজ্ঞাসা করলাম : কোথায় চলেছ?

রবি বললো : আমি আপনাকে এড্‌সন টেলরের সমাধি দেখাতে নি
যাচ্ছি।

সে কে?

রবি সগৌরবে বললো : এ দেশের একজন মহিলা। এখানকার ওক
সমাধি ক্ষেত্রে তাঁর কবরের ওপরে লেখা আছে—First to go ove
the Horse Shoe Falls in a barrel and live. October 24
1901. আপনি বলুন, একজন মহিলা যদি একটা পিপের মধ্যে ঢুকে

ওপর থেকে নিচে গড়িয়ে পড়তে পারে, তাহলে আমি কেন সাঁতার কেটে এসে লাফিয়ে পড়তে পারবো না ?

আমি দাঁড়িয়ে পড়ে বললাম : এইখানে দাঁড়িয়েই তুমি আমাকে সেই মহিলার গল্প বলো।

এক কথায় রবি রাজী হয়ে গেল। বললো : হ্যাঁ, একখণ্ড পাথর ছাড়া আর কিছু দেখবার নেই। তার চেয়ে এই জলের ধারে দাঁড়িয়েই তাঁর গল্পটা আপনাকে বলি।

রবির কাছেই আমি অ্যানি এড্‌সন টেলরের গল্প শুনলাম। এই মহিলা একজন স্কুল টীচার ছিলেন। নাচও শেখাতেন। বিধবা হবার পর অর্থকষ্টে ছিলেন। হঠাৎ একদিন শোনা গেল যে তিনি একটা পিপের মধ্যে ঢুকে নায়েগ্রা জলপ্রপাত জয় করবেন। তাঁর বয়স তখন তেতাল্লিশ বছর।

কেউ বিশ্বাস করলো ; কেউ বললো, বাজে কথা। তবু অনেকে ব্যাপারটা দেখবার জন্যে ছুটে এলো। কিন্তু রিভারম্যানরা নদীর স্রোত দেখে বললো, আজ কিছুতেই এ কাজ করতে দেওয়া যাবে না। যারা মজা দেখবার জন্যে জড়ো হয়েছিল, তারা সেই মহিলাকে বিদ্রূপ করে ফিরে গেল। মিসেস টেলর এই ঠাট্টা শুনে কাঁদলেন ; বললেন, প্রাণ গেলেও আমি আমার কথা রাখবো।

তার পরের দিন রিভারম্যানরা রাজী হলো। মিসেস টেলর তাঁর তিন মণ ওজনের কাঠের পিপের মধ্যে ঢুকলেন, আর স্রোতে গড়িয়ে দেওয়া হলো সেই পিপে। পৃথিবীর প্রথম মানুষ নায়েগ্রা প্রপাতের উপর থেকে নিচে পড়বে। দর্শকরা রুদ্ধশ্বাসে দেখবে যে তিন সেকেণ্ডে পিপেটা গড়িয়ে পড়লো প্রায় পৌনে দুশো ফুট নিচে। দশ সেকেণ্ডের জন্য অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল পিপেটা। লোকে এই সময়টা অনন্ত কাল বলে ভেবেছিল। তারপর সতেরো মিনিট সময় লাগলো পিপেটাকে উদ্ধার করে তীরে আনতে।

একখানা করাত দিয়ে পিপেটা কেটেই একজন চেঁচিয়ে উঠলো, মাই গড, শি'জ অ্যালাইভ। বেঁচে আছেন ভদ্রমহিলা।

সমস্ত আমেরিকায় তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো। কিন্তু অর্থের বরাত ছিল না

তাঁর। প্রায় বিশ বছর পর নিঃস্ব অবস্থায় এই সিটি অফ নায়েগ্রা ফল্‌সেই তাঁর মৃত্যু হয়।

মিসেস টেলরের গল্প বলেও রবি থামলো না। বললো : এর দশ বছর পর ববি লীচ নামে একজন সার্কাসের লোকও নায়েগ্রা জয় করেছিল। তারপর তিনজন ব্যর্থ হবার পরে জিন লুসিয়ার নামে আর একজন পুরুষ নায়েগ্রা জয় করেছিল সতেরো বছর পরে। তারপর একটি সাত বছরের ছেলে—

সাত বছরের ছেলে!

আমি চমকে উঠলাম।

রবি বললো : এ ঘটনাটা একেবারে অন্য রকম। ১৯৬০ সালে ঘটেছিল এই দুর্ঘটনা।

তারপরে রবি এই দুর্ঘটনার কথাও বললো। রজার উডওয়ার্ড নামে একটি সাত বছরের ছেলে তার দিদি জিনের সঙ্গে উঠেছিল একটা নৌকোয়—উপরে নায়েগ্রা নদীতে। নৌকোর ইঞ্জিন হঠাৎ বিগড়ে গেল। নৌকোওয়ালা তার নৌকো সামলাতে পারলো না, উল্টে গেল নৌকো। স্রোতের ধাক্কায় মেয়েটি এমন জায়গায় এসে পড়লো যে দু'জন দর্শক তাকে টেনে তুলতে পারলো। কিন্তু ছেলেটি গড়িয়ে পড়লো নিচে—একশো ষাট ফুট নিচে। কিন্তু আশ্চর্য! বিশেষ কিছুই হলো না তার। নিচের লোকেরা তাকেও উদ্ধার করতে পারলো। কিন্তু নৌকোওয়ালা বাঁচলো না, তার কোনো হদিসই পাওয়া গেল না।

রবি সগৌরবে বললো : সেই ছেলেটার ছবি দেখেছি আমি। সাত বছরের ছেলে।

রবির মুখের ভাব দেখে মনে হলো যে সাত বছরের ছেলে যদি অসাধ্য সাধন করতে পারে, তাহলে সেও পারবে। কিন্তু সে কথা বলবার আগেই একজন পুলিশম্যান এসে আমাদের সামনে দাঁড়ালো। গায়ে শার্ট, গলায় টাই, আর মাথায় টুপি। খুব ভারিক্কি চেহারার মানুষ, কিন্তু মুখের ভাব খুব অপ্রসন্ন নয়। রবির দিকে চেয়ে বললো : তোমাকে আমার সঙ্গে একবার আসতে হবে।

রবি হকচকিয়ে গেল। এ দেশের পুলিশের এমন হাবভাব যে বলতে সাহস পেল না, কেন? অসহায় ভাবে একবার আমার দিকে চেয়ে ভদ্রলোককে অনুসরণ করে চলে গেল।

আমি এই ঘটনার কোনো কারণ খুঁজে পেলাম না। তাই কতকটা অভি-ভূতের মতো চারিদিকে চেয়ে এর কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করলাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম যে একটি মেয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। তারপরই বুঝতে পারলাম যে এই মেয়েটিকেই আমি কিছুক্ষণ আগে দেখতে পেয়েছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই কি মেয়েটি আমাদের অনুসরণ করে এখানে এসেছে! রবিকে যে পুলিশে ধরে নিয়ে গেল, এতেও কি হাত আছে এই মেয়েটির! কিন্তু এই কাজে তার কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে, সহসা আমি তা ভেবে পেলাম না।

আমি কোনো দিকে এগোব কিনা তা স্থির করবার আগেই মেয়েটি আমার পাশে এসে উপস্থিত হলো। একটু হাসবার চেষ্টা করে বললো : নমস্কার।

আমি উত্তর দিলাম তাকে।

মেয়েটি বললো : তোমাদের দেশে এ রকম ফল্‌স নেই?

বললাম : না।

সত্যি?

বললাম : ফল্‌স অনেক আছে, কিন্তু এর সঙ্গে তুলনা হয় না।

সে সব বুঝি ছোট?

হ্যাঁ।

ওপর থেকে কি তোমরা নিচে লাফিয়ে পড়?

কখনও না।

মেয়েটি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলো : কেন লাফাও না?

হেসে বললাম : হাড়গোড় গুঁড়িয়ে যাবার ভয়ে।

প্রাণ যাবার ভয় নেই?

প্রাণে বাঁচার কোনো আশাই বোধহয় নেই। কিন্তু এ সব কথা তুমি জানতে চাইছো কেন?

বলে আমি মেয়েটির মুখের দিকে তাকালাম।

মেয়েটি আমার প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে বললো : জানো এখানেও লোকে লাফাত। চারজন বেঁচে গেছে, কিন্তু মরেছে তিনজন। এখন সবাই বলছে যে আর একজনও বাঁচবে না। তাই কেউ লাফাবার চেষ্টা করলে পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। নাথান বোয়ারের নাম তুমি শুনেছ?

না।

জানো না তাকে?

বললাম : জানি না।

মেয়েটি বললো : বছর দশেক আগে সে-ই শেষবার লাফিয়েছিল একটা লোহা আর রবারের বলের মধ্যে ঢুকে। সে বেঁচে গিয়েছিল, কিন্তু পুলিশের ক্যাপ্টেন তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়েছিল। অন্টারিও সরকার খুব ভালো। তাই একশো তেরো ডলার ফাইন করেই ছেড়ে দিয়েছিল নাথান বোয়ারকে।

মেয়েটি চকিত দৃষ্টিতে চারদিকে চাইছিল, আর গল্প বলছিল আমাকে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : অমন সাহসের কাজ করার জন্যে ফাইন হলো কেন?

মেয়েটি বললো : কেন, আত্মহত্যার চেষ্টা করে নি বুঝি? বেঁচে সে গেল, তা তো নিতান্তই তার ভাগ্যের জোরে।

তারপরেই বললো : পুলিশ এখন খুব সতর্ক। কাউকে দেখে সন্দেহ করলেই তাকে ধরে নিয়ে যায়।

তারপর?

তারপর বোধহয় ছেড়ে দেয়।

ধরে রাখে না তো কাউকে?

না।

বলেই মেয়েটি অদৃশ্য হয়ে গেল। আর আমি সতর্কভাবে চারদিকে চাইলাম। হ্যাঁ, ঠিকই সন্দেহ করেছি। রবি একা ফিরে আসছে। হনহন করেই ফিরছে। দূর থেকেই মনে হচ্ছে যে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে সে ফিরছে। আমার

কাছে এসেই সে চেঁচিয়ে উঠলো : যত সব—
বলেই থেমে গেল।
আমি জিজ্ঞাসা করলাম : কী হলো ?
কী আর হবে ? আমি যে লাফাবার চেষ্টা করছি, তার কোনো প্রমাণ আছে ? নিশ্চয়ই ঐ শয়তানীটা নালিশ করেছে !
কোন্ শয়তানী বলো তো !
কেন, দেখতে পান নি ! পেছনে পেছনে ঠিক এসে জুটেছে। ঐ দেখুন, আমাকে ফিরতে দেখে এ দিক থেকে সরে গিয়ে ঐ দিকে দাঁড়িয়ে আমাদের লক্ষ্য করছে। দেখুন বজ্জাতি ! এতক্ষণ এদিকেই তাকিয়ে ছিল, এবারে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আমাদের যেন দেখতেই পায় নি, এমনি ভাব।
আমার বেশ হাসি পাচ্ছিল। কিন্তু আমি সেই হাসি গোপন করে বললাম : মেয়েটা কে বলতো !
আমাদের ইউনিভার্সিটির একটা মেয়ে। ঐ তো সবাইকে বলে, ভারতীয় ছেলেরা ভারি ভীতু. আর আমেরিকায় আসে এ দেশের মেয়েদের নিয়ে ফূর্তি করতে।
হেসে বললাম : তবে তো সত্যিই খুব খারাপ মেয়ে।
রবি এবারে আমার মুখের দিকে তাকালো। কথাটা সত্যি বলছি, না ঠাট্টা করছি। বোধহয় সেই কথাই বোঝবার চেষ্টা করলো।
জিজ্ঞাসা করলাম : ডাকব ওকে ?
বলে হাতছানি দিয়ে মেয়েটিকে ডাকলাম।
মেয়েটি বোধহয় আড়চোখে লক্ষ্য করছিল। আমার হাতছানি দেখে এগিয়ে এলো। আমিও রবিকে নিয়ে এগিয়ে গেলাম তার দিকে। বললাম : এসো, আমরা আজ একসঙ্গে লাঞ্চ খাবো।
মেয়েটি ভারি আশ্চর্য হলো আমার প্রস্তাব শুনে। বললাম : তারপর একসঙ্গেই ফিরবো।
মেয়েটির চেয়েও বোধহয় বেশি আশ্চর্য হলো রবি। কী বলবে, তা ভেবে

পেল না।

বলতে বলতেই আমি মেয়েটিকে বললাম: আর ভয় পেও না। রবি বলেছে, ও আর এদিকে একা আসবে না, এলে তোমার সঙ্গেই ও বেড়াতে আসবে।

সত্যি ?

বলে মেয়েটি আমার মুখের দিকে তাকালো।

বললাম: ও আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। এ দেশ থেকে ফিরে গিয়ে ওকে সংসারের অনেক দায়িত্ব নিতে হবে। নিজের জীবন নিয়ে যে ছিনিমিনি খেলা যায় না, তা ও বুঝতে পেরেছে।

মেয়েটি আর্তস্বরে বললো: সে কথা ও বুঝেছে কোথায় ?

বললাম: এইবারে বুঝেছে।

দু'জনের মুখের দিকেই আমি তাকিয়ে দেখলাম। দু'জনের দৃষ্টিই এখন প্রসন্ন দেখাচ্ছে, আর কোনো রুদ্ধ আবেগে আর্দ্র।

১২

ছেলেবেলায় ভূগোলে আমি মায়ামির নাম পড়ি নি। মায়ামি নামের কোনো শহর যে আমেরিকায় আছে, সে কথাও শুনি নি কারও কাছে। এ কালের ছেলেমেয়েরা হয়তো আমার এই কথা শুনে হাসবে। কিন্তু তার জন্যে আমার কোনো লজ্জা নেই। মায়ামি কোনো পুরনো শহর নয়, পঞ্চাশ বছর আগে তার কোনো অস্তিত্বই যে ছিল না, এ কথা বিলও স্বীকার করেছিলেন। ফ্লোরিডা স্টেটের বিসকেন বে-র তীরে মায়ামি ও মায়ামি বীচ অতি অল্প সময়েব মধ্যে পৃথিবীর লোকের কাছে এমন অবিশ্বাস্য ভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

এখানে এসে আরও অনেক জনপ্রিয় জায়গার নাম শুনেছি—কোকো বীচ, কেপ কেনেডি, ডিজ্‌নিল্যাণ্ড প্রভৃতি। কবে কে কোথায় এই সব জায়গার কথা বলেছে, তা মনে রাখতে পারি নি। ওয়াল্ট ডিজনির নাম

শোনা থাকলেও ডিজ্‌নি ল্যাণ্ড বা ডিজ্‌নি ওয়ার্ল্ড যে কোথায় তা আমার জানা ছিল না। কিন্তু গ্র্যাণ্ড কেনিয়ানের কথা আমি ভূগোলেই পড়েছিলাম। পাহাড় কেটে গভীর খাদের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে কলরেডো নদী, অপরূপ তার নৈসর্গিক শোভা, নায়েগ্রা জলপ্রপাতের মতোই আকর্ষণীয়। প্রেইরি নামে একটি বিশাল তৃণভূমির নামও ভূগোলেই পড়েছিলাম, তার সর্বগ্রাসী আগুনের কথায় আমাদের খাণ্ডব বন দহনের কথা মনে পড়তো। সব জায়গায় না পেলেও আমি এর কয়েক জায়গায় কাজ পেয়েছিলাম। আর আশ্চর্য হয়েছিলাম এই সব জায়গা থেকে!

মায়ামির পরিবেশ যে কত রমণীয় তা এখানে এসে নামবার আগে অনুমান করতে পারি নি। মায়ামি থেকে মায়ামি বীচ সাড়ে তিন মাইল পূর্বে আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে একটি সমৃদ্ধ শীতাবাস। আমাদের দেশে যেমন সাহেবদের আমল থেকে গ্রীষ্মের সময় পাহাড়ে যাবার রেওয়াজ চলে আসছে, এ দেশের ধনীরা শীতকালে সমুদ্রের তীরে আসেন অবকাশ যাপনে। মায়ামি তাই শীতের শহর, গ্রীষ্মে তার আদর নেই। গ্রীষ্মকালে এসে আমি মায়ামির অন্য রূপ দেখলাম।

আট মাইল বিস্তৃত এর সমুদ্রবেলা। একধারে অগণিত হোটেল, অন্য ধারে উত্তাল অতলান্তিক। নানা স্থান থেকে যাত্রীরা এসেছে স্বাস্থ্য উদ্ধারে ও সমুদ্রের সৌন্দর্য উপভোগে। কিন্তু এখন এখানে এ দেশের মধ্যবিত্তের ভিড়। ধনীর ভিড় হবে শীতকালে। হোটেলে তখন জায়গা থাকবে না। ভাড়া বাড়িয়েও স্থানাভাব থাকবে সর্বত্র।

হোটেলের সংখ্যা এ শহরে কিছু কম নয়। শ পাঁচেক হোটেল আছে বলে শুনলাম। ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত এখানকার সীজন। ফেব্রুয়ারিতেই ভিড় সবচেয়ে বেশি। মায়ামি বীচের কোনো হোটেলে গ্রীষ্মকালের যে ভাড়া দিতে হয়, ফেব্রুয়ারিতে সেই হোটেলেই ভাড়া গুণতে হয় চারগুণ বেশি। একদিনের একটি ঘরের ভাড়া কয়েক শো টাকা, এ কথা আমরা ভাবতেই পারি না। একটু সস্তায় থাকতে হলে মায়ামি বীচের উত্তর দিকের হোটেলগুলোতে থাকতে হয়। হোটেল ভালো, কিন্তু খরচ

অপেক্ষাকৃত কম। সমুদ্রের মুখোমুখি হোটেলেই খরচ বেশি। মায়ামি বীচ চেম্বার অফ কমার্সে এই সব খবর নিয়ে আমি ঐ দিকেরই একটি হোটেলে উঠেছিলাম।

মায়ামিতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। সেখানেই আমার কাজ ছিল নানা জায়গার ছেলেমেয়েরা পড়াশুনো করছে। আমেরিকান ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এ দেশের নিগ্রো ছেলেমেয়েদেরও দেখলাম। আবার ল্যাটিন আমেরিকারও অনেক ছেলেমেয়ে এখানে আছে। তারা স্প্যানিশ ভাষা ভালো জানে। পরে জেনেছিলাম যে ল্যাটিন অ্যামেরিকা থেকে স্প্যানিশ জানা অনেকেই এখানে বেড়াতে আসে। তাদের সুবিধার জন্য হোটেলে ও স্টোরগুলোয় স্প্যানিশ জানা লোকজনও কাজ করে।

ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের মধ্যে আমি লো আর্ট গ্যালারি দেখলাম অনেক সুন্দর ছবি ও মূর্তি আছে। ভিলা ভিজকায়া নামে আর এক জায়-গায় নাকি এই রকমের সংগ্রহ আছে।

মায়ামিতে আর কী দেখবার আছে জানতে চেয়ে কী ওয়েস্ট নামে একটা সুন্দর জায়গার খবর পেলাম। গ্রে হাউণ্ড বাসে ওভারসীজ হাইওয়ে ধরে যেতে হয়। এক জায়গায় জলের উপর দিয়ে রাস্তা গেছে। এমন রাস্তা নাকি পৃথিবীর আর কোথাও নেই। ঘণ্টা তিনেক সময়ে এই অপরূপ সুন্দর জায়গাটি দেখে আসা সম্ভব শুনে পরদিন সকালে একখানা গ্রে হাউণ্ড বাসে চেপে বসলাম।

রহমান পরিবারের সঙ্গে আমার পরিচয় হলো এই বাসের মধ্যে। এঁদের আমি চিনতাম না, চেনবার কথাও নয়। প্রথম নজরে মনে হয়েছিল যে এঁরা ভারতীয়। বাঙালী বুঝতে সময় লেগেছিল অনেক। শাড়ি দেখলেই ভারতীয় বলে মনে হয়, কিন্তু আলাপ না হলে ভারতের কোন্ অঞ্চলের মানুষ তা বোঝা মুস্কিল। কিন্তু আমি যে গোড়াতেই বোঝার ভুল করে-ছিলাম তা বুঝলাম আলাপ হবার পর। এঁরাও বাঙালী, কিন্তু ভারতীয় নন। এঁরা পূর্ব বাঙলার মানুষ। অর্থাৎ বাঙলা দেশের অধিবাসী। ইনিও আমাকে চিনতে পারেন নি বলে প্রথমে কথা বলেছিলেন উর্দু ভাষায়,

আর আমি জবাব দিয়েছিলাম হিন্দীতে। ভেবেছিলাম যে এঁরা বোধহয় উত্তর প্রদেশের মানুষ।

বাসে আমি আগে ভাগে উঠে নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছিলাম। রহমান পরিবার উঠেছিলেন পরে। মিস্টার ও মিসেস রহমান এবং কুড়ি বাইশ বছর বয়সের একটি মেয়ে। কিন্তু এই মেয়েটিকে দেখে আমি চমকে উঠেছিলাম। পরনে তার সাদা থানের মতো কাপড়, পাড় নেই, আঁচলও নেই। গায়ের জামাটিও সাদা। মাথার চুল এলেমেলো ও উস্কোখুস্কো। অথচ মুখখানি সুন্দর। আর গায়ের রঙ ধবধবে ফর্সা। আমেরিকায় এসে মেয়েদের কোনো প্রসাধন না দেখে আমি আর আশ্চর্য হই না। অনেক মেয়েই এখানে প্রসাধন করে না, জামাকাপড়েও অত্যন্ত সাদাসিধে ভাব। আমাদের নিজেদের দেশেই বরং মেয়েদের মুখে একটুখানি স্নো পাউডার না দেখলে আশ্চর্য লাগে। ক্লাবে ও পার্টিতে উৎকট প্রসাধন দেখতেই আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

পরে জেনেছিলাম যে এই মেয়েটির নাম ফতিমা। কিন্তু গোড়াতেই সে আমার মনোযোগ প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছিল। বাঙলার মেয়ে জানলে তাকে আমি বিধবা ভাবতাম, কিন্তু বাঙালী না হলে তা ভাবা যায় না। অবাঙালী কুমারী মেয়েদের আমি এই রকম সাদা কাপড় পরতে দেখেছি। বিদেশে এসেও নানা অঞ্চলের ভারতীয় মেয়েদের এই বেশে দেখছি। মনে হচ্ছে যে সাদা জামা কাপড় পরা অনেক মেয়েই এখানে ফ্যাশন ভাবছে। কিন্তু এমন রুক্ষ চেহারার মেয়ে তারা নয়। বেশ যত্ন করে প্রসাধন করে তারা, নানা রকমের দামী কস্‌মেটিক্স ব্যবহার করে। দূর থেকেই তাদের দেহের সৌরভ আসে ভেসে।

আরও একটা রীতি লক্ষ্য করা যায়। বাঙালীরা যেমন বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শাড়ির রঙ পাল্টায়—গাঢ় থেকে ফিকে রঙ, তারপর সাদা, অবাঙালীরা তেমনি উল্টো কাজ করে—সাদা থেকে হাল্কা রঙ, তারপর বয়স বেশি হলেই ঝকঝকে রঙের শাড়ি জামা। মিসেস রহমানেরও কতকটা এমনি হয়েছিল। তিনি একখানা ঝকঝকে পাড়ের ঢাকাই শাড়ি পরেছিলেন। মেয়ের সাদা শাড়ির সঙ্গে বেশ বেমানান দেখাচ্ছিল। কিন্তু এই ঢাকাই

শাড়ি দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল যে ইনি বাঙালী হতে পারেন। কিন্তু সাদা থানের মতো শাড়ি পরা মেয়েকে সঙ্গে দেখে নানা রকম সন্দেহে মন অস্থির হয়ে উঠছিল।

শেষ পর্যন্ত বাসেই পরিচয় হয়ে গেল। নামধাম শুনে নিশ্চিন্ত হলাম। মেয়েটি বিধবা নয়, এখনও তার বিয়েই হয় নি। 'ফল্লজফিতে এম. এ. পাশ করেছে, রিলিজিয়ন নিয়ে রিসার্চ করছে মায়ামি বিশ্ববিদ্যালয়ে। বাঙলা দেশের সরকারী কাজে মিস্টার রহমান আমেরিকায় এসেছেন স্ত্রীকে নিয়ে, মেয়েকে দেখতে এসেছেন মায়ামিতে।

ফতিমার সঙ্গেও আমার কথা হলো। জিজ্ঞাসা করলাম : এ দেশ কেমন লাগছে?

ফতিমা কোনো উত্তর না দিয়ে একটু হাসলো। সে হাসিতে তার মনের কোনো খবর পেলাম না।

এর পরে আমি পথের দিকে মনোযোগ দিলাম।

এই গ্রে হাউণ্ড বাসগুলি যেমন সুন্দর, ওভারসীজ হাইওয়েও তেমনি সুন্দর রাজপথ। এক সময়ে দেখলাম যে আমরা জলের উপর দিয়ে যাচ্ছি, জলের উপর দিয়েই পথ। দুধারে জল, অথচ পুলের উপর দিয়ে যাচ্ছি না। এ রকমের দৃশ্য আমি আগে কোথাও দেখি নি। রামেশ্বরে যাবার সময় খানিকটা পথ জলের উপর দিয়ে গেছে। যে অল্প একটুখানি পথ আমি ট্রেনে পার হয়েছিলাম লোহার পুলের উপর দিয়ে। তার সঙ্গে এই পথের কোনো তুলনা হয় না। কী-ওয়েস্ট জায়গাটির চেয়ে এই পথটিই যেন বেশি সুন্দর।

কিন্তু পথের এই শোভার চেয়ে ফতিমা আমার কাছে বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠলো। এমন অল্প বয়সের একটি সুন্দর মেয়ে নিজের সম্বন্ধে এমন উদাসীন কেন, এই কথাটি জানবার জন্যেই আমার কৌতূহল হলো বেশি। কিন্তু সরাসরি এ কথা জানতে চাওয়া যায় না। আমি তাই তার সুযোগ খুঁজতে লাগলাম।

এই সুযোগ পেলাম কী ওয়েস্টের একটা পার্কে। আমরা যখন পায়ে হেঁটে সেই পার্কটি দেখছিলাম, তখন হঠাৎ দেখা গেল যে ফতিমা আমাদের

সঙ্গে নেই। থমকে দাঁড়িয়ে আমি বললাম : ফতিমা কোথায় ?

মিসেস রহমান খুবই আস্তে আস্তে হাঁটছিলেন, আর মিস্টার রহমান অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিলেন। মিসেস রহমান আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পিছন দিকে তাকাতেই আমিও তাঁর দৃষ্টিকে অনুসরণ করে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। একটা ফুল গাছের ঝোপের পাশে ফতিমাকে দেখতে পাচ্ছি। হাতে যে বড় ব্যাগটা ছিল, তা মাটিতে রয়েছে। ঘাসের উপরে একখানা আসন বিছিয়ে ফতিমা নমাজ পড়ছে।

সত্যি কথা বলতে কি, এর আগে আমি কোনো মেয়েকে নমাজ পড়তে দেখি নি। কলকাতার ময়দানে ঈদের নমাজ পড়তে দেখেছি লক্ষ পুরুষ মানুষকে। মেয়েরাও যে নমাজ পড়ে, এ আমি প্রথম দেখলাম। আর আশ্চর্য হলাম এই দেখে যে মিস্টার ও মিসেস রহমান নমাজ পড়ছেন না, নমাজ পড়ছে তাঁদেরই কুমারী মেয়ে।

আমাকে আশ্চর্য হতে দেখে মিসেস রহমান বললেন : খুব আশ্চর্য হচ্ছেন তো ! ছোট থেকেই মেয়ে আমার ঐ রকম। এ দেশে এসেও পাঁচবার নমাজ পড়ছে। কোরাণ পড়ে রোজ। আর দেখতেই তো পাচ্ছেন, নিজের দিকে কোনো নজর নেই।

আমি বললাম : এমন ভালো মেয়ে আজকাল আর দেখা যায় না।

ভালো মেয়ে !

বলে মিসেস রহমান একবার আমার মুখের দিকে তাকালেন। বোধহয় বুঝবার চেষ্টা করলেন, আমি তামাশা করছি, না সত্যি বলছি। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন : নিজের মেয়ে হলে বুঝতে পারতেন কেমন ভালো মেয়ে !

তখন আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা বলছিলাম। আর অপেক্ষা করছিলাম ফতিমার জন্য। বললাম : ছেলেবেলায় আমাদেরও ধর্মজ্ঞান কিছু ছিল, মেয়েদের ব্রত নিয়ম ছিল, লক্ষ্মী পূজো পাঁচালি পড়া ছিল—

বাধা দিয়ে মিসেস রহমান বললেন : সে তো খারাপ নয়, বাড়াবাড়িটাই খারাপ। এ মেয়ের বিয়ে দেবো কী করে। সে কথা ভেবেছেন কি ?

বললাম : বিয়ে তো দিতেই হবে, আর ভালো পাত্রের সঙ্গে।

মিসেস রহমান একটু শুকনো হাসি হেসে বললেন : আপনার বোধহয় এ দুর্ভাবনা নেই। তাই আপনি সেকেলে লোকের মতো কথা বলছেন।

আমি কিছু লজ্জা পেলাম তাঁর কথা শুনে। বললাম : কেন, নিয়ম কানুন সব পাল্টে গেছে নাকি ?

মিসেস রহমান এ কথার উত্তর দিলেন না। খানিকটা তফাতে দাঁড়িয়ে মিস্টার রহমান আমার প্রশ্ন শুনতে পেয়েছিলেন। পরে আমাকে বলেছিলেন : এ দেশের খোঁজ-খবর বোধহয় রাখেন না।

আমি কোনো উত্তর না দিয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম।

মিস্টার রহমান বলেছিলেন : এ দেশের স্কুলের মেয়েরাও নাকি ডেটিং করছে স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে। ডেটিং করা নিশ্চয়ই বোঝেন !

তার পরেই বললেন : ঐ বয়েস থেকে ও সব কি আর ভালো ! বোঝবার বয়েস হলেই ও সব মানায়। কিন্তু এদেশের মায়েদের ধারণা অন্য রকম। নিজের মেয়ে যদি কোনো ছেলের কাছে ডেট না পায় তো মায়েরা উদ্বিগ্ন হয় বেশি। বড় হলে মেয়ের বিয়ে হবে কী করে, সে ভাবনায় নাকি ঘুম হয় না। ফতিমার জন্যেও আমাদের ভাবনা।

এ কথা আমি আগেও শুনেছি, বিশ্বাস হয় নি পুরোপুরি। কিন্তু এ আলোচনা না করে আমি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলাম : বিয়ে হলো প্রজাপতির নির্বন্ধ। সময় হলেই বিয়ে হবে।

ফতিমা বেশি দেরি করে নি। চটপট আসনখানা ঝেড়ে ব্যাগের ভিতরে পুরে হনহন করে আমাদের কাছে চলে এলো। আর কোনো কথা না বলে মায়ের সঙ্গে এগোতে লাগলো।

১৩

আমি ভেবেছিলাম যে ফতিমার গল্প বোধহয় এইখানেই শেষ হয়ে গেল। কিন্তু তা হলো না। কী ওয়েস্ট নামের সেই সুন্দর জায়গাটি দেখে আমরা

মায়ামিতে ফিরে এলাম। ফেরার পথে মিস্টার রহমান জানতে চাইলেন, কোথায় উঠেছি। আমি যে একটা সস্তার হোটেলে আছি, সে কথা গোপন করলাম না। মায়ামি বীচের এই হোটেলগুলিও ভালো। আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের কোনো অভাব নেই। কিন্তু ভাড়া কম। সমুদ্রের সৈকতে নয় বলেই সস্তা। মায়ামি বীচ চেম্বার ও কমার্সের পরামর্শে আমি সেখানে উঠেছিলাম।

সপরিবারে মায়ামি বীচে বেশি দিন থাকতে হলে কী বিস্কেন হোটেল ও ভিলায় থাকা যেতে পারে। একটি দ্বীপের মধ্যে এই জায়গাটিও চমৎকার। আর তাতে এফিসিয়েন্সি অ্যাপার্টমেন্ট আছে। সেখানে নিজেরা রেঁধে বেড়ে খাওয়া যায়।

বাস থেকে নেমে হোটেলে ফেরবার পর মনে পড়লো যে রহমান দম্পতি কোথায় উঠেছেন তা জেনে নেওয়া হয় নি। তাইতেই ভেবেছিলাম যে তাঁদের সঙ্গে দেখা হবার আর কোনো উপায় রইলো না। ফতিমার গল্পও বোধহয় শেষ হয়ে গেল।

কিন্তু না। কতকটা আকস্মিক ভাবেই ফতিমাকে আমি তার পরের দিনই দেখতে পেলাম। সেদিন তার বাবা মা সঙ্গে ছিলেন না। যাকে কাছে দেখলাম, সে আর এক আশ্চর্য চরিত্র। নিজের চোখে না দেখলে আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতাম না।

সকালবেলায় আমি হেঁটে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। শুনেছিলাম যে এখানে হেঁটে বেড়ানোর একটা অদ্ভুত আনন্দ আছে। লিঙ্কন মালের দু'ধারের দোকান-পাট দেখতে দেখতে পথ চলতে যেমন ভালো লাগে, তেমনি ভালো লাগে মেন ল্যাণ্ডের সঙ্গে মায়ামি বীচের সংযোগকারী কজ্‌ওয়ের উপর দিয়ে হাঁটতে।

অন্যান্য শহরের মতো এখানেও আছে ট্যুরিস্ট বাসে সব কিছু ঘুরে দেখবার ব্যবস্থা। চার ঘণ্টার জন্য চার ডলার লাগে। নৌকোয় চেপেও অনেক কিছু দেখা যায়। আবার ব্লিম্প্‌ বা হেলিকপ্টারে শহর দেখার ব্যবস্থাও আছে। শুধু মায়ামি আর মায়ামি বীচ নয়, আশে পাশের অনেক কিছু

দেখারও সুবিধা আছে। হায়ালে পার্ক মুসা আইল ইণ্ডিয়ান ভিলেজ—এ সব দেখতেও ভালো লাগে।

কিন্তু সবচেয়ে ভালো লাগে মায়ামির সমুদ্রবেলা। আট মাইলের এই বেলা-ভূমি যে কত আকর্ষণীয়, না দেখলে তা বোঝা যায় না। হাঁটতে হাঁটতে আমি এই বেলাভূমির এমন এক জায়গায় পৌঁছলাম, যেখানে সমুদ্রের ধারে অনেক মেয়ে পুরুষ একত্র হয়েছে। কেউ স্নান করছে, কেউ বালির উপরে বসে সকালের মিষ্টি রোদ উপভোগ করছে।

অন্যমনস্কভাবে খানিকটা এগিয়ে এক জায়গায় এসে আমি থমকে দাঁড়ালাম। ফতিমা না! ফতিমাই তো! কিন্তু সে তো একা নয়! তার খুব কাছে একজন যুবককে দেখতে পাচ্ছি। কী করছে ছেলেটি!

আমি তাদের আরও একটু কাছে এগিয়ে গেলাম। এখান থেকে ছেলেটিকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। বালির উপরে পদ্মাসনে বসে আছে খালি গায়ে, গলায় মোটা উপবীত। ডান হাতে সেই পৈতে জড়িয়ে জপ করছে চোখ বুঁজে। বুঝতে কষ্ট হলো না যে সমুদ্রের জলে স্নান করে সে এখন জপতপ করছে।

নিজের চোখকে প্রথমটায় বিশ্বাস হয় নি। হবার কথা নয়। দেশে গঙ্গার ধারে এ রকম দৃশ্য অনেক দেখেছি। কিন্তু আমেরিকার এই শৌখিন শহরে এই রকম ধর্মনিষ্ঠ ছেলেমেয়ে দেখতে পাব, এ আমার স্বপ্নেরও অতীত ছিল।

একটুখানি তফাতে চুপ করে বসে ছিল ফতিমা। চোখ তার সমুদ্রের দিকে, মন কোন্ দিকে জানি না। কেন জানি না, তার সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা আমার জেগে উঠলো। এগিয়ে গেলাম তার দিকে।

আমাকে চিনতে পেরে সে উঠে দাঁড়ালো। হাত জুড়ে নমস্কার করলো।

বললাম : আজ একা?

ফতিমা কোনো কথা না বলে হাসলো। সেই মিষ্টি হাসি। কিন্তু আমার মনে হলো যে প্রশ্নের উত্তরটা সে সতর্কভাবে এড়িয়ে গেল।

আমি তার পাশে আজ আর একটা ব্যাগ দেখতে পেলাম। তার উপরে

একটা প্যাণ্ট আর বুশ সার্ট। এটি যে ঐ ছেলেটির তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ছেলেটির সম্বন্ধে কিছু না বলে জিজ্ঞাসা করলাম : বাবা মা কোথায় ?

ফতিমা বললো : জানিনে।

সে কি !

এইবারে খোঁজ নিতে যাব।

বলে আবার হাসলো।

আড়চোখে চেয়ে আমি দেখতে পেয়েছিলাম যে ছেলেটি আমার দিকে একবার তাকিয়ে দেখেছে। তারপরে আবার মন দিয়েছে সন্ধ্যা আহ্নিকে। কৌতূহলের আমার অন্ত ছিল না। কাল কী-ওয়েস্টে ফতিমাকে দেখেছি নমাজ পড়তে, আর আজ এই যুবকটিকে দেখছি গভীর মনোযোগে সন্ধ্যা আহ্নিক করছে। মায়ামির ছেলেমেয়েরা কি মায়াবী !

আমি আমার কৌতূহল দমন করতে পারলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম : চেনো ওকে ?

ফতিমা সংক্ষেপে বললো : হ্যাঁ।

কিন্তু কে তা বললো না।

তার পরিচয় জানবার জন্য আমি সাগ্রহে প্রশ্ন করলাম। তোমার বন্ধু বুঝি !

ফতিমা এবারেও বললো : হ্যাঁ।

কিন্তু এর বেশি কিছু বললো না।

ভাবলাম, আরও কয়েকটা প্রশ্ন করি। কিন্তু ফতিমা আর কিছু বলবে না বুঝতে পেরে নিজের মান নিয়ে আমি সরে গেলাম।

কিন্তু দূরে গিয়েও আমি ফিরে তাকালাম একবার। সন্ধ্যা আহ্নিক শেষ করে সেই যুবকটি তখন উঠে দাঁড়িয়ে সূর্য প্রণাম করছে। তার পরনে একখানা ধুতি।

প্রণাম শেষ করে ফতিমার কাছে গিয়ে তার প্যাণ্ট সার্ট চেয়ে নিল। সেগুলো পরে ধুতিটা ভাঁজ করে রাখলো ব্যাগের ভিতরে। বালির উপর থেকে একখানা গামছাও সংগ্রহ করে ব্যাগে পুরলো। তারপর ব্যাগ হাতে

নিয়ে হাঁটতে শুরু করলো উল্টো দিকে।

দেখতে দেখতেই ভিড়ের মধ্যে তারা মিলিয়ে গেল। কিন্তু তাদের কথা আমার মন থেকে মিলিয়ে গেল না। কী আশ্চর্য এই ছেলে মেয়ে দুটি! এদের যদি আমি একসঙ্গে স্নান করতে দেখতাম হুটোপাটি করে, তাহলে এমন আশ্চর্য হতাম না। একসঙ্গে মদ খেয়ে নাচতে দেখলেও না। ছেলে-মেয়েরা আজকাল এমন অনেক কাজ করে যা দেখতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। কিন্তু ধর্মচর্চার এমন দৃষ্টান্ত আমি এর আগে কখনও দেখি নি। সেও আবার এক ধর্মের চর্চা নয়।

নিঃশব্দে আমি হাঁটতে লাগলাম। অনেকটা পথ হাঁটলাম। হাঁটতে এখানে কষ্ট হয় না। হাঁটারও যে আনন্দ আছে, এখানে তা উপভোগ করছি। সামনে কোনো গন্তব্যস্থল থাকলেই বোধহয় হাঁটতে কষ্ট হয়। গন্তব্যস্থলে পৌঁছবার আগ্রহই এই পরিশ্রমের কারণ। কিন্তু এখানে আমার যাবার কোনো জায়গা নেই বলেই হাঁটছি। হেঁটেই আজ অনেক কিছু দেখবো এবং পছন্দ মতো একটা জায়গায় কিছু খেয়ে নেব।

হ্যাঁ, পয়সা আজ হয়তো একটু বেশি লাগবে। গ্র্যাণ্ড মা'স কিচেনে আজ আর খাব না। খরচ কম হলেও সেখানে খাবার জন্য কোনো পরিশ্রম করবো না। কিন্তু কোথায় কী খাওয়া যায়, তা একটা সমস্যা। সমুদ্রের খাবার খেতে হলে জো'স স্টোন ক্র্যাবে খেতে হবে। কিন্তু শুনেছি, সেখানে খাবারের খুব দাম। ফ্রেঞ্চ বা ইতালিয়ান খাবারেরও দাম খুব বেশি। শেষ পর্যন্ত সাধারণ লোকের ভিড় বেশি দেখে একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়লাম। এ বড়লোকের দেশ। এখানে সস্তা বলতে যা বোঝায়, আমাদের দেশের হিসাবে তা মারাত্মক। দেশে কোনো দিন মুরগির মাংস খেলে আমরা ফলাও করে বন্ধুদের বলি, আর এরা তা রোজ খেতে হলে বলে যে পয়সার অভাবে কিছু না খেয়ে আছে। কয়েকটা সস্তার খাবারের নাম জেনে ফেলেছি। আলুর চপকে বলে হ্যাশ ব্রাউন, আর সানি সাইড আপ মানে ডিমের পোচ। টোস্ট আর চা বা কফির সঙ্গে দিব্বি ব্রেকফাস্ট করা যায়। বেকন বা সসেজ খাই না, হ্যামবার্গার গোমাংসের। স্টেকও তাই। ডিনারে

স্টেক খেতে দেখেছি, অনেকে এমন স্টেক খায় যা কাটলে রক্ত দেখা যায়। কাজেই আমার লাঞ্চ বা ডিনারে মুরগির মাংস, অথবা ডিমের স্ক্র্যাম্ব্‌ল বা সানি সাইড আপ। আর ড্রিঙ্কস বলতে কোক বা সেভেন আপ। কম পয়সায় কফি।

যাই হোক, খাবার জন্যে এদেশে আসি নি, এসেছি কিছু দেখবার জন্যে। সামান্য কিছু খেয়ে নিয়ে মায়ামির কাছাকাছি কয়েকটা জায়গা দেখতে বেরিয়ে পড়লাম।—সী কোয়েরিয়াম, প্যারট জাঙ্গল, মায়ামি সার্পেণ্টারিয়াম ও মাঙ্কি জাঙ্গল। নানারকম অদ্ভুত জীব দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশেও আজকাল অ্যাকোয়েরিয়াম, রেপটাইল হাউস, পাখির স্যাঙ্কচুয়ারি হয়েছে। বিদেশীরা এসে সে সবও দেখছে। কিন্তু এদের এ সব কেমন সে সম্বন্ধে একটা ধারণা হওয়া দরকার। কাছাকাছি দুটো কান্ট্রি পার্কও আছে। তাদের নাম ক্র্যাণ্ডন পার্ক ও বেকার্স হলোভার। সম্ভব হলে সে দুটোও দেখে ফিরবো।

কিন্তু এদেশে যে এরকম করে দেখা কত ব্যয়সাধ্য তা একটু পরেই বুঝতে পেরেছিলাম। এ সব দেখবার জন্য গ্রে লাইন বা উইলিস মোটর কোচ কণ্ডাকেটেড ট্যুরই ভালো। যা খরচ করবার তা প্রথমে দিয়েই নিশ্চিন্ত। খরচের পরিমাণ না জেনে পথে বেরোনো এ দেশে নির্বুদ্ধিতা। তাই বেলা থাকতেই আবার নিজের হোটেলে ফিরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

একটু পরেই জানতে পেলাম যে এক ভারতীয় দম্পতি আমার খোঁজ করতে এসে ফিরে গেছেন।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম : ভারতীয় দম্পতি ! কী নাম তাঁদের ?

মিস্টার ও মিসেস রহমান—

কিন্তু ওঁরা তো ভারতীয় নন !

আপনার দেশের লোকই তো বললেন।

বুঝতে আমার সময় লাগে নি। ঠিক কথাই বলেছেন। একই দেশের লোক আমরা, একই বাঙলার লোক। হোক তা ভারত ও বাঙলা দেশের অধীন। আসলে তো আমরা বাঙালী ! তাই বললাম : ও হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন।

তা কী বলে গেছেন ?

খুব বিপদে পড়েছেন। ফিরলেই যেন টেলিফোন করি তাঁদের। নম্বরটা রেখে গেছেন।

বলেই একটা কানেক্সন করে দিলো।

মিস্টার রহমান টেলিফোন ধরে বললেন : আপনি ফিরেছেন !

আমি উদ্বিগ্ন ভাবে বললাম : কী খবর বলুন তো !

এখন আর কোথাও বেরোবেন না তো ?

বললাম : না।

মিস্টার রহমান বললেন : তবে আসছি আমরা। এখুনি আসছি।

বলেই টেলিফোন ছেড়ে দিলেন।

আমি আরও উদ্বিগ্ন হলাম। এই বিদেশে এমন কী বিপদ হতে পারে যে আমার কাছে আসছেন সাহায্যের জন্য !

কিন্তু কিছু ভেবে পাবার আগেই তাঁরা হুড়মুড় করে এসে পড়লেন। আর মিস্টার রহমানকে পিছনে ফেলেই মিসেস রহমান এগিয়ে এলেন আমার দিকে। বেশ ব্যস্তভাবে বলে উঠলেন : এখন উপায় কী হবে বলুন তো !

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম : আগে বসুন স্থির হয়ে, তারপরে বলুন কী হয়েছে।

মিসেস রহমান একটু দম নিয়ে বললেন : ফতিমা বলছে—

সমুদ্রের ধারে দেখা সেই ছেলেটার কথা আমার মনে পড়ে গেল। বললাম : একটা বামুনের ছেলেকে বিয়ে করতে চাইছে ?

মিস্টার রহমান যেন আঁৎকে উঠলেন। বললেন : জানেন আপনি !

আর মিসেস রহমান যেন এলিয়ে পড়লেন তাঁর চেয়ারে।

বললাম : ছেলেটা একটু বেশি গোঁড়া। হাবভাবে সেটা প্রকাশ করে।

মিসেস রহমান বলে উঠলেন : আমি তার জামার নিচে মোটা পৈতে দেখেছি।

আর আমি তাকে সমুদ্রে স্নান করে খালি গায়ে ধুতি পরে জপতপ করতে দেখেছি।

মিস্টার রহমান বললেন : ফতিমা সঙ্গে ছিল ?

বললাম : সঙ্গে ছিল বলেই তো চিনেছি ছেলেটাকে। সে তার জামা কাপড় আগলাচ্ছিল। বলেছিল, বন্ধু। কিন্তু বিয়ের কথা বলে নি।

মিসেস রহমান বললেন : আমাকেই কি ছাই বলেছিল ? আজ সেই ছেলেটা এসে সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব করেছে।

ফতিমা কী বলে ?

সে তার এক কাঠি ওপরে। সে নাকি ঠিক করেই রেখেছে।

আমি বললাম : আপনাদের অনুমতি না পেলে ?

মিস্টার রহমান বললেন : অনুমতি ! ঠিক যখন করে রেখেছে—

মিসেস রহমান আর্তস্বরে বলে উঠলেন : দোহাই আপনার। আপনি ওদের বুঝিয়ে বলুন, নিরস্ত করুন ওদের।

সভয়ে বললাম : আমি নিরস্ত করবো ! ওরা কি আমার কথা শুনবে! কেন শুনবে !

মিসেস রহমান বলে উঠলেন : শুনবে, নিশ্চয়ই শুনবে। যুক্তির কথা তাদের বুঝিয়ে বললে না শুনে তারা পারবে না। আমি তাদের পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনার কাছে।

উত্তেজিতভাবে এক সঙ্গে এতগুলো কথা বলে তিনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আমি উভয়েরই বেদনার্ত দৃষ্টি দেখলাম। এ যে আমাদের অনেক দিনের পুরনো সংস্কার তা মানি। অনেক যুগের, অনেক দুঃখের ও অনেক রক্ত-ক্ষয়ের ইতিহাস আছে এর পিছনে। কিন্তু এ যুগের ছেলেমেয়ে যদি এই সংস্কার স্বেচ্ছায় ঝেড়ে ফেলতে চায় তো কোন্ যুক্তি দিয়ে আমি তাদের বাধা দেবো। কিন্তু রহমান দম্পতির মুখের দিকে চেয়ে আমি অস্বীকার করতে পারলাম না। তাঁদের অনুরোধ মেনে নিয়ে বললাম : আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করতে পারি।

এ নিয়ে আরও কিছুক্ষণ আলোচনা হলো। তারপর তাঁরা ফিরে গেলেন। আর আমি এক নতুন ভাবনার অকূল সমুদ্রে ডুবে গেলাম। ফতিমাদের

কথাই ভাবলাম। তাদের বারণ করবার মতো যুক্তি কি আমার আছে! ধর্ম জাত দেশ—এসব তো মানুষের সৃষ্টি। তার সংস্কার গোঁড়ামি, হিংসা ও ঘৃণা—এসবে প্রশ্রয় দেয় তার সমাজ ও রাষ্ট্র। কিন্তু মানুষের মন তো মানুষের সৃষ্টি নয়। একজনই এর সৃষ্টিকর্তা। তাঁর কাছে মানুষে মানুষে কোনো ভেদ নেই। মানুষকে তিনি সব দিয়েছেন, দেন নি শুধু মনের উপর অধিকার। মন তাই নিজের মনের শাসনে চলে, নিজের মনের যুক্তিতে। বাহিরের কোনো যুক্তির বোঝা অন্যের মনের উপরে চাপানো যায় না। প্রেম মানুষের মনের নিজস্ব সম্পদ, আর একটি মনের গভীর উত্তাপে ফুলের মতো ফোটে। সেই উত্তাপেই তার পুষ্টি। উত্তাপ ফুরিয়ে গেলেই শুকিয়ে যায় ফুল। তৃতীয় ব্যক্তির হস্তক্ষেপ এখানে অবান্তর। কিছুক্ষণের মধ্যেই মন আমার বিষণ্ন হয়ে গেল।

ফতিমা অনেকক্ষণ পরে এলো তার বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে। বললো : আপনি ডেকেছেন আমাদের ?

বলতে পারলাম না যে আমি ডাকি নি, বা তোমার মা তোমাদের পাঠিয়েছেন। বললাম : তোমাদের সঙ্গে ছুটো কথা বলতে চাই। বোসো একটুখানি।

তারা বসবার পরে বললাম : তোমাদের নিজেদের কথা আগে বলো।

স্বল্পভাষী ফতিমা বললো : আমার বন্ধু তরুণ ভট্টাচার্য।

তরুণ আমাকে একটা নমস্কার করে বললো : আমরা বিয়ে করছি।

এইবারে একটা সুযোগ পেয়ে ফতিমাকে বললাম : তোমার বাবা মা এ কথা জেনে খুব ছুঃখ পেয়েছেন।

ফতিমা বললো : জানি। আপনি নিজের কথা বলুন।

সংক্ষিপ্ত, কিন্তু স্পষ্ট কথা। বুঝলাম যে ফতিমা তাদের সময় নষ্ট করতে এখানে আসে নি। তাই বললাম : তোমাদের ছু'জনের ধর্ম এক নয় বলেই তাঁদের ভাবনা।

তরুণ বললো : আমি যদি এ দেশের একটা মেয়েকে বিয়ে করে নিজের দেশে নিয়ে যাই তো তার জাত ধর্মের কথা আমার বাবা মা জানতে

চাইবেন না। মেম বিয়ে করে এনেছি বলে মুখে একটুখানি অসন্তোষ প্রকাশ করবেন। কিন্তু পরে সগৌরবে বলবেন, আমাদের ছেলের মেম বউ। দুঃখ যদি পান তো সে পণ না পাবার জন্যে।

ফতিমা বললো : আর আমার বেলাতেও তাই। যদি এ দেশের একটা ছেলেকে বিয়ে করে এ দেশেই থেকে যাই তো আমার বাবা মা দুঃখ পাবেন দেশে ফিরলাম না বলে। মাঝে মাঝে দেশে গিয়ে তাঁদের দেখে এলে সে দুঃখও থাকবে না। কারণ মেয়ে তো চিরকাল তাঁদের ঘরে থাকবে না!

বললাম : বুঝেছি।

তরুণ বললো : না, বোঝেন নি আপনারা। এ দেশের ধর্মজ্ঞানহীন ছেলে-মেয়েদের বিয়ে করে নিজেদের ধর্ম বিসর্জন দেবার জন্যে কেউ এতটুকু দুঃখ পাবেন না।

ফতিমা বললো : অথচ আমরা দুটি প্রতিবেশী দেশের ছেলেমেয়ে যদি পরস্পরের ধর্মকে শ্রদ্ধা করে বিয়ে করি তো আপনাদের আপত্তি কিসের! কেন আপনারা আমাদের এই বিয়ে সমর্থন করতে পারছেন না?

আমি এ কথার প্রতিবাদ করতে পারলাম না। রহমান দম্পতিকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি বলে সমর্থন করতেও দ্বিধাবোধ হয়।

আমাকে নীরব দেখে ফতিমা বললো : আমি রোজ কোরাণ পড়ি। কোরাণে খুব স্পষ্ট ভাষায় লেখা আছে—লাকুম দিন আকুম ওয়ালে ইয়াদিন। এর মানে হলো। তোমার ধর্ম তুমি মানো। আমি মানবো আমার ধর্ম।

তরুণ বললো : আমাদের বেদের কথা তো আপনার জানাই আছে—যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যঃ। সবার জন্য আমাকে কল্যাণ বাক্য বলতে দাও, শুধু হিন্দুর জন্যে নয়, দেশের আত্মীয় ও অনাত্মীয় বিদেশী-দের জন্যেও। শূদ্রায় চার্যায় চ স্বায় চারণায় চ।

ফতিমা বললো : আমার বাবা-মার কথা নয়, আপনি নিজের কথা বলুন।

আমার নিজের মনে কোনো দ্বিধা ছিল না, বললাম : তোমাদের বিয়ের খবর আমাকে দিও, আশীর্বাদ করবো তোমাদের।

আশ্চর্য রকমের প্রসন্নতা দেখলাম দুজনেরই দৃষ্টিতে। হেঁট হয়ে তার আমাকে প্রণাম করলো। তাদের মাথায় হাত রেখে বললাম : সমাজ বা সংস্কার বড় নয়, বড় নয় ধর্ম বা রাজনীতি। মানুষের মনই সবচেয়ে বড়, বড় তার প্রেম। এই প্রেমই মানুষের মুক্তি আনবে।

কোনো কথা না বলে নিঃশব্দে তারা বেরিয়ে গেল।

তারপর আমার মন আমাকে প্রশ্ন করলো, আমি কি ভুল বললাম! যা বললাম তা কি সত্য নয়!

কিন্তু বাহিরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে দিনান্তের রঙীন আলোয় মায়ামির নীল আকাশ তখন ঝলমল করছে।

১৪

মায়ামির কাছে আর একটি সুন্দর শহর আছে, তার নাম নিউ অর্লিয়ান্স। নাম শুনেই বোঝা যাবে যে এটি একটি ফরাসী শহর। তাই প্রশ্ন হবে, আমেরিকায় ফরাসী নাম এলো কেমন করে?

এক সময়ে ইউরোপের মানুষ তাদের ভাগ্য অন্বেষণে বেরিয়ে যেমন ভারতবর্ষে এসে উপস্থিত হয়েছিল, তেমনি আমেরিকায় গিয়েও তারা পৌঁছেছিল। ইংরেজ নাম রেখেছিল নিউ ইয়র্ক নিউ জার্সি, আর ফরাসীরা নাম রেখেছিল নিউ অর্লিয়াঁ। তাই হয়। নতুন দেশে গিয়ে নাম রাখবার কথা মনে হলেই নিজের দেশের পুরনো নামগুলো আগে মনে আসে।

ফ্লোরিডা রাজ্যের কাছেই লুইসিয়ানা রাজ্য। তারই প্রধান শহর নিউ অর্লিয়ান্স। মেক্সিকো উপসাগর থেকে ষাট মাইল উত্তরে মিসিসিপি নদীর ধারে এই পুরানো ফরাসী শহরটি আজও বহু ট্যুরিস্ট আকর্ষণ করে।

একজন আমেরিকান আমাকে বলেছিলেন, মায়ামি থেকে ফেরার পথে নিউ অর্লিয়ান্স নিশ্চয়ই দেখবেন! ডিউক্স কারে নামের পুরনো ফরাসী পাড়াটি দেখতে ভুলবেন না।

পাড়ার নামটি ঠিক বুঝতে পারি নি। দু একবার শুনে এ সব নামের সঠিক

উচ্চারণ বোঝা যায় না। আর সবাই এক রকমের উচ্চারণ করে না। যেমন, কেউ নিউ অর্লিয়ান্স বলে, কেউ বলে ন্যু অর্লিয়ঁা। কেউ বুরবন স্ট্রীট বলে, কেউ বলে বোর বোঁ স্ট্রীট। বুঝতে পারি যে ফরাসী নাম বলেই উচ্চারণের এই বিপত্তি।

বুরবন স্ট্রীটের কথা বলেছিলেন এক ভারতীয় ভদ্রলোক। উপহাস করে বলেছিলেন : হ্যাঁ, নিউ অর্লিয়ান্স যখন যাচ্ছেন, তখন বুরবন স্ট্রীটেও একবার ঢুঁ মেরে আসবেন। ও জায়গাটা না দেখলে নিউ অর্লিয়ান্স দেখাই আপনার হবে না।

বলেছিলাম : একটু বুঝিয়ে বলবেন না ?

ভদ্রলোক বলেছিলেন : বোঝাবার কিছু নেই। নিজের চোখেই সব দেখতে পাবেন।

তারপর বোধহয় ভাবলেন যে স্বদেশের লোককে একটু সদুপদেশ দেওয়া দরকার। তাই বললেন : বেলেল্লাপনার যে কোনো সীমা নেই, তা সেখানে গেলেই বুঝতে পারবেন। তাই ফরাসী শহর দেখবার নামে ট্যুরিস্টরা সেখানে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। কেউ বলছে, অপূর্ব সেখানকার রেস্তোরাঁ আর ক্রেয়ল কুইসিন। কেউ বলছে, এ রকম ডিক্সিল্যাণ্ড জাজ আর কোথাও শোনা যায় না। আর কিছু নিরীহ ট্যুরিস্ট ফরাসী পাড়ার ঘরবাড়ির আর্কিটেক্‌চার, ডেলগাডো মিউজিয়ম আর মিসিসিপি নদী দেখে বলছে, সত্যিই একটি রোমান্টিক শহর।

একটু থেমে বলেছিলেন : যখন সেখানে যাবেন বলেই ব্যবস্থা করেছেন, তখন একটা পরামর্শ দিই আপনাকে। নাইট ক্লাবে গিয়ে খরচ করবার দরকার নেই, কতক জায়গায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে দরজা দিয়ে উঁকি মেরেই সব দেখতে পাবেন।

তারপরে জিজ্ঞাসা করলেন : কোথায় থাকবেন তা জানতে চাইলেন না ?

বললাম : কোনো জায়গায় থাকলেই হলো।

কোনো জায়গায় বললেই তো হয় না, একটা জায়গার নাম আপনাকে জানতেই হবে। রয়াল অর্লিয়ান্স হোটেলে উঠবেন। ফরাসী পাড়ার মাঝখানে

নতুন লাক্সারি হোটেল হয়েছে, কিন্তু খরচও বেশি নয়।

কিন্তু এসব কথায় আমি খুব বেশি গুরুত্ব দিই নি। নিউ অর্লিয়ান্স যেতেই হবে, এ রকম কোনো সংকল্প আমার ছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে এই শহরে একটা সন্ধ্যা আমি অনায়াসেই কাটাতে পারি।

উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূল আমার দেখা হয়ে গিয়েছিল—উত্তরে ক্যানাডার সীমান্তে নায়গ্রা থেকে দক্ষিণে ফ্লোরিডার মায়ামি বীচ পর্যন্ত। এবারে পশ্চিম উপকূলে যেতে হবে। অ্যারিজোনার গ্র্যাণ্ড কেনিয়ান দেখে লস এঞ্জেল্‌স। তারপর সানফ্রান্সিস্কো থেকে হাওয়াই দ্বীপ হয়ে ঘরে ফেরা। মায়ামি থেকে অ্যারিজোনার পথেই নিউ অর্লিয়ান্সে স্টপ ওভার। একটি সন্ধ্যা সেখানে কাটাবার জন্যেই আমি নেমে পড়লাম। আর সেই ভদ্রলোকের কথা মতোই রয়াল অর্লিয়ান্স হোটেলে এসে উঠলাম।

বেশ জমজমাট হোটেল। এই পুরনো ফরাসী পাড়ায় হোটেলটি যে নতুন তৈরি হয়েছে তা দেখলেই বোঝা যায়। পথে আসতে আসতেই এই শহর সম্বন্ধে একটা ধারণা হয়েছে। মিসিসিপি নদীর ধারে শহর, কিন্তু সমুদ্র থেকে বেশ খানিকটা দূরে। আমাদের কলকাতার মতোই। সন্ধ্যাবেলার বাতাসকে লোকে সমুদ্রের বাতাস বলে। আর সবচেয়ে আশ্চর্য হলাম একখানা ঘোড়ার গাড়ি দেখে—আট চাকার গাড়ি জুড়ি ঘোড়ায় টানছে। কলকাতায় এখনও আমরা এ দৃশ্য দেখি। এ রকম গাড়িকে আমরা ফিটন বলি। আগে নানারকম নামের গাড়ি ছিল—ব্রুহাম, ল্যাণ্ডো, ভিক্টোরিয়া—এই ধরনের নাম। আমেরিকার মতো দেশে ঘোড়ার গাড়ি এখনও চলছে দেখে বিস্ময়ের আমার সীমা রইলো না।

হোটেলের সামনেই এই ধরনের একখানা গাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে এক বুড়ো ভদ্রলোক আমার দিকে এগিয়ে এলেন। আমার আপাদ মস্তক দেখে বললেন : ইণ্ডিয়ান?

বললাম : হ্যাঁ।

ভদ্রলোক গর্বিত ভাবে বললেন : দেখেই চিনতে পেরেছি।

এতে গৌরব বোধ করার কোনো কারণ নেই। কিন্তু ভদ্রলোক পাশের

একজনকে ডেকে বললেন : দেখলে তো, ইণ্ডিয়ান দেখলেই আমি চিনতে পারি।

আমি তাঁকে খুশী করবার জন্য বললাম : আশ্চর্য আপনার ক্ষমতা!

ভদ্রলোকের হাতে এক টুকরো চুরুট ছিল। সেটা ঠোঁটে চেপে আগুন ধরালেন। তারপরে খানিকটা ধোঁয়া মুখে নিয়ে বললেন : প্রায় চল্লিশ বছর আগে আমি তোমাদের দেশে গিয়েছিলাম।

সত্যি!

ভদ্রলোক আমার হাত ধরে রাস্তার এক ধারে টেনে আনলেন। তারপরে বললেন : তোমরা স্বাধীন হবার পরে কি তোমাদের দেশে চুরি আরও বেড়েছে?

আমি আশ্চর্য হলাম এই প্রশ্ন শুনে। ওয়াশিংটনের চার্লস বীন আমাকে যে ভাবে পরীক্ষা করেছিলেন, সে রকম কৌশলে নয় বলেই পাল্টা প্রশ্ন করলাম : তোমাদের দেশে কি চুরি নেই?

বলে তাঁর উত্তরের অপেক্ষা না করেই আমি হোটেলের ভিতরে ঢুকে গেলাম। বুঝতে পেরেছিলাম যে এটা অভদ্রতা হলো, কিন্তু এ ছাড়া কোনো উপায় খুঁজে পেলাম না।

হাতে আমার সময় বেশি ছিল না। তাই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়বো ভাবছিলাম। কিন্তু এখানে কী দেখবার আছে, তা কারও কাছে জেনে নেওয়া দরকার। হোটেলের অফিসে খবর নিতে গিয়ে প্রথমেই কণ্ডাক্টেড ট্যুরের কথা শুনলাম। পৌনে তিন ডলার খরচ করলে দু ঘণ্টায় শহর দেখা যায়। আর নতুন যে কথা শুনলাম তা হলো সাড়ে পাঁচ ডলারে সাড়ে চার ঘণ্টার লাইট লাইফ ট্যুর। নিউ অর্লিয়ান্সের রাতের জীবন নাকি দিনের চেয়ে অনেক লোভনীয়। এ ছাড়াও মিসিসিপি নদীতে প্রমোদ ভ্রমণ আছে আড়াই ঘণ্টার, তার দক্ষিণা তিন ডলার। ঘোড়ার গাড়িতে বেড়ানো তো নিজের চোখেই দেখেছি।

যে ভদ্রলোক আমাকে এই খবর দিলেন, তিনি বললেন : আপনার হাতে সময় যখন কম, তখন এক কাজ করুন। একটা ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে

সিভিক সেণ্টার দেখে নদীর ধারে চলে যান। অন্ধকার হলে ফিরবেন বুরবন স্ট্রীটে। পায়ে হেঁটেই সব দেখতে পাবেন।

ধন্যবাদ দিয়ে আমি বেরিয়ে এলাম। আর এই অল্প সময়ে যতটুকু সম্ভব ততটুকুই দেখলাম।

এই ফরাসী পাড়ার রাস্তাগুলো সরু সরু। প্রতিটি বাড়িতে লোহার সুন্দর রেলিঙ ও ব্যালকনি আছে। উঠোনও আছে। এ পাড়ার বয়স নাকি পৌনে তুশো বছর। এই শহর সমেত গোটা লুইসিয়ানা রাজ্যটা ফরাসী অধিকারে ছিল। নেপোলিয়ান নাকি টাকার প্রয়োজনে এ জায়গাটা বিক্রি করে দিয়েছিলেন পঞ্চাশ লাখ ডলারে। তাই এখানে ফরাসী পাড়া আছে, আছে ফরাসীদের ফেলে যাওয়া কিছু আচার আচরণ, বুরবন হুইস্কি ইত্যাদি। কিন্তু এখানকার অধিবাসীদের কে ফরাসী আর কে নয়, আমাদের চোখে তা ধরা পড়ে না।

একা একা পায়ে হেঁটেই এই পাড়াটা দেখলাম। রয়াল স্ট্রীটের তু'ধারের পুরনো দোকানগুলো এখনও বেশ আকর্ষণীয় মনে হলো।

ক্যাবিলডো দেখতে গেলাম না। সেখানে নাকি লুইসিয়ানা বিক্রির দলিল সই হয়েছিল। এখন সেখানে লুইসিয়ানার স্টেট মিউজিয়াম হয়েছে। তার বদলে আমি চলে গেলাম নিউ সিভিক সেণ্টারে। নিউ অর্লিয়ান্সের সরকারী এলাকা এটি। সিটি হল, স্টেট অফিস বিল্ডিং, সুপ্রিম কোর্ট, সিভিল কোর্ট ও পাবলিক লাইব্রেরি এই এলাকায়। তারপর মিসিসিপি নদীর ধারে গিয়ে সন্ধ্যা হবার আগে পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম।

এইখানেই দেখা হলো একটি নিগ্রো যুবকের সঙ্গে। সে কঠিন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে দেখছিল। তা দেখতে পেয়েই আমি বললাম : হ্যালো!

হায়!

বলে সে আমার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল।

কিন্তু আমি তার দিকে এগিয়ে গিয়ে নিজের পরিচয় দিলাম। ভারতীয় জেনে সে কিছুটা স্বাভাবিক হলো। বললো : আমি ভেবেছিলাম, তুমি

স্প্যানিশ কিংবা মেক্সিকান।

হেসে বললাম : আমি তোমার মতো কালা আদমি।

ছেলেটি নিজের নাম বলেছিল ভিক্টর, আমেরিকার নিগ্রো। লম্বা বলিষ্ঠ দেহ, মাথার কোঁচকানো চুল কড়া করে ছাঁটা। পুরু ঠোঁট, আর গায়ের রঙ মিশ কালো। কিন্তু আমার কথা শুনে বিষণ্ণ হাসি হেসে বললো : আমেরিকায় তোমরা কালো জাত নও।

কেন ?

তোমরা সাদা ককেশিয়ান জাত। মোটরের লাইসেন্সে তোমাদের কালার লেখা হয় হোয়াইট।

আমি এ কথা জানতাম না। বললাম : আমাদের কবি রবীন্দ্রাথ সাধারণ ভারতীয়ের চেয়ে অনেক বেশি ফর্সা ছিলেন। কিন্তু বিলেতে ইংরেজরা তাঁকে ব্ল্যাকি বলে ডাকতো শুনেছি।

কিন্তু ঘৃণা বোধহয় করতো না। করলেও দোষ দেওয়া যায় না। তারা ছিল বিদেশী রাজার জাত। কিন্তু আমরা ?

বলে আমার মুখের দিকে তাকালো।

আমি কোনো উত্তর দিলাম না দেখে ভিক্টর নিজেই বললো : নিজেদের দেশেই আমরা হীন হয়ে আছি। বড় বড় শহরে আমাদের দুরবস্থা বোধহয় দেখ নি !

বললাম : না।

নিউ ইয়র্ক দেখেছ ?

দেখেছি।

নিউ ইয়র্কের প্রাণ কেন্দ্র হলো ম্যান হাটন দ্বীপ। তারই মাঝখানে আমাদের নিগ্রো পাড়া হার্লেম। কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির পাশে। কিন্তু কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে তুমি কটি নিগ্রো ছাত্র দেখেছ ?

এর উত্তর আমার জানা নেই।

ভিক্টর নিজেই উত্তর দিলো, বললো : আঙুলে গুনতে পারবে। কিন্তু কী ভাবে আমাদের প্রবেশ নিষেধ করেছে জানো ?

বললাম : না।

ভিক্টর বললো : পড়ার খরচ এত বেশি যে আমাদের মতো গরিবদের সেখানে পড়া সম্ভব নয়। আর—

বলো।

তারা রেজাল্ট এত ভালো চায় যে সেও একটা বাধা।

বললাম : এ বাধা খারাপ নয়। বরং রেজাল্টের ওপরে স্কলারশিপ থাকলে গরিব ছেলেও ভালো জায়গায় পড়তে পারবে। আমাদের দেশে এখন এই সুবিধা হয়েছে। সরকারী টাকাতেই অনেক গরিব ছেলে উচ্চ শিক্ষার জন্যে বিদেশে যেতে পারছে।

ভিক্টর আবার হাসলো। এক রকমের শুকনো হাসি। বললো : যে কোনো শহরে ঘেটোয় ঢুকলে আমাদের প্রতি সরকারের দরদ দেখতে পাবে।

ঘেটো কী ?

তোমরা স্লাম বলো, বস্তি। ঘেটো কোন্ শহরে নেই ? ওয়াশিংটন ডি. সি., নিউ ইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া, শিকাগো, বোস্টন—আমেরিকার সব শহরে আমাদের ঘেটো আছে। অন্ধকার নোংরা গলির মধ্যে পুরনো জীর্ণ বাড়িতে অশিক্ষিত দরিদ্র নিগ্রোরা দুঃসহ জীবন যাপন করছে। পট খাচ্ছে, মদ খাচ্ছে, খালি বোতলগুলো রাস্তায় ফেলে দিচ্ছে। কলহ মারামারি খুন জখম, অত্যন্ত নোংরা সব ব্যাপার। এ দিকে শহরের বস্তি উন্নয়ন পরিকল্পনায় নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে বিদেশীদের দেখাবার জন্যে। ওয়াশিংটন ডি. সি. তে দেখ নি ?

বললাম : না।

দেখে যেও। সবই লোক দেখানো দরদ।

নদীর ধারে অন্ধকার তখন ঘনিয়ে আসছিল। বললাম : চলো, বুরবন স্ট্রীটে একবার যাওয়া যাক।

ভিক্টর আমার সঙ্গে পা বাড়িয়েও থেমে গেল। যেন চমকে উঠেছে, এই ভাবে বললো : বুরবন স্ট্রীটে !

বললাম : হ্যাঁ, শুনেছি সন্ধ্যেবেলায় নাকি খুব সুন্দর এই জায়গাটা।

ভিক্টর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো : তুমি যাও।

তুমি যাবে না ?

তোমার আনন্দ তাহলে মাটি হয়ে যাবে।

কেন ?

আমাকে তোমার সঙ্গে দেখে তোমাকেও কেউ আমল দেবে না।

আর তারপরেই ভিক্টর আমাকে বুঝিয়ে বললো : ও পাড়াটা হলো সাদা লোকদের জন্যে। কালোদের প্রবেশ নিষেধ, এ কথা কোথাও লেখা নেই। কিন্তু কারও আত্মসম্মান জ্ঞান থাকলে সে কোথাও ঢুকতে পারবে না। আর একটি সন্ধ্যার জন্যে দুশো ডলার দিলেও কোনো সাদা মেয়ে তাকে তার অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে যাবে না।

দুশো ডলার তো আমাদের দেড় হাজারেরও বেশি টাকা।

আমার বিস্ময় দেখে ভিক্টর বললো : তোমাকে অনেক কম টাকাতেই নিয়ে যেতে রাজী হবে।

বলে একটা বিষণ্ণ হাসি হাসলো।

আমি বললাম : কিন্তু খবরের কাগজে তো—

বাধা দিয়ে ভিক্টর বললো : হ্যাঁ, সাদা মেয়ের কালো ছেলেকে বিয়ে করার খবর হয়তো কাগজে পড়েছ। হয়তো খুব ফলাও করে ছেপেছে এই কথা। কিন্তু সে আরও মারাত্মক।

কেন ?

যারা আমাদের ঘৃণা করে তারা ঢের ভালো। তাদের স্বরূপটা আমরা জানি। কিন্তু লিবারেল বলে যারা পরিচিত, তাদেরই আমরা ভয় পাই বেশি। একটা মুখোস পরে নিজের স্বরূপটা তারা ঢেকে রেখেছে। সবই লোক দেখাবার জন্যে, বুঝলে ?

আমি প্রতিবাদ করবার জন্য বললাম : তোমাদের বিচারে যে ভুল হচ্ছে না, তা বলতে পার ?

উত্তরে ভিক্টর বললো : কিছুদিন এ দেশে থাকলে তুমিও এ কথা মেনে নেবে।

তারপরেই ব্যস্ত ভাবে বললো : আমি আসি।

বলে আর অপেক্ষা করলো না, লম্বা পা ফেলে অন্ধকারে সে মিলিয়ে গেল।

পরক্ষণেই আমি বুঝতে পারলাম যে ভিক্টর পালিয়ে গেল। অন্ধকারে যে একটি সাদা দম্পতি আমাদের লক্ষ্য করছিলেন, তা বুঝতে পারলাম একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে। পিছন ফিরে দেখলাম তাঁদের। ভদ্রলোককে চিনতে আমার সময় লাগলো না। এঁরই সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল হোটেলের সামনের রাস্তায়।

হায়!

বলে ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। পরিচয় করিয়ে দিলেন তাঁর সঙ্গিনীর সঙ্গে। নিজের স্ত্রী নয়, নাম রেবেকা সংক্ষেপে বেটি। কিন্তু পদবীটা বললেন না।

বেটি আমাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন : ঐ নিগ্রোটা কী বলছিল?

যা বলছিল তা আমি বলতে পারলাম না। বললাম : গল্প করছিল।

মিস্টার গিল্‌স বললেন : ভারি নেমকহারাম এরা। ওদের জন্যে প্রাণ দিলেও ওরা তোমার ডেড বডিকে একটা থ্যাঙ্ক্‌স দেবে না।

এই প্রসঙ্গ পরিবর্তন করবার জন্য আমি বললাম : কোথায় যাচ্ছেন?

মিস্টার গিল্‌স বললেন : ভাবছি বুরবন স্ট্রীট একবার ঘুরে যাব।

প্রথমটায় খুশী হয়েছিলাম এই কথা শুনে, ভেবেছিলাম সঙ্গী পাওয়া গেল। কিন্তু তার পরেই মনে পড়ে গেল সকালের সেই কথা। আর তা মনে পড়তেই মনটা দমে গেল।

মিস্টার গিল্‌স বোধহয় কিছু সন্দেহ করেছিলেন। বললেন : সকালে তুমি রেগে গেলে, তা না হলে সেই ঘটনাটা তোমাকে বলতাম।

বলে পুরনো একটা গল্প শোনালেন আমাকে। কোন্ একটা স্টীমার ঘাটে তাড়ি খাবার সময় তাঁর পার্স খোয়া গিয়েছিল, সেই গল্প। তাড়িখানায় নয়, একটা মেয়ে মানুষের ঘরে। ভদ্রলোক অকপটে বেটির সামনেই এই গল্প বললেন। আর একটা ঘোড়ার গাড়ি ধরে বললেন : উঠে পড়।

আমি বেটিকে আগে উঠতে দিলাম। তারপর নিজে উঠে উল্টোদিকে

বসলাম। মিস্টার গিল্‌স বসলেন বেটির পাশে। বললেন : বুরবন স্ট্রীটে চলো।
পথে যেতে যেতেই জানতে পারলাম যে তাঁদের বিয়ে এখনও হয় নি। বলতে গেলে বিয়ের আগেই হানিমুন করতে এসেছেন এখানে।
কথাটা শুনে আমি আকাশ থেকে পড়লাম। কিন্তু আমার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে মিস্টার গিল্‌স বললেন : অনেক দিন থেকেই আমি একজন সঙ্গী খুঁজছিলাম। হঠাৎ কাগজে এঁর বিজ্ঞাপন দেখে যোগাযোগ করলাম। এটা আমার চতুর্থ বিয়ে হবে।
তারপরেই বেটিকে জিজ্ঞাসা করলেন : তোমার যেন ক নম্বর ?
ভদ্রমহিলা আঙুলে গুনে বললেন : নবম।
ভদ্রলোক একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন : যাক. আমাকে আর ওল্ড হোমে যেতে হলো না।
আমেরিকার লিভিং টুগেদারের কথা শুনেছি। বিয়ে না করে একসঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর মতো থাকা। ওল্ড হোমের কথাও শুনেছি। খরচ দিয়ে সেখানে থাকতে হয়। নিঃসঙ্গ বুড়োবুড়িরা সেখানে শেষ জীবন কাটাতে যায়। পছন্দ মতো জমি কেনে গ্রেভ ইয়ার্ডে, অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার খরচ জমা রাখে ব্যাঙ্কে। আর ছেলে মেয়েরা দূরে দূরে স্ফূর্তির জীবন যাপন করে। দিন দিন খরচ বাড়ছে বলেই বুড়োবুড়িরা আজকাল লিভিং টুগেদার বেশি পছন্দ করছে।
ভদ্রলোক বললেন : আমার যৌবনটা আমি সেনাদলে নষ্ট করেছি।
আর আমি নষ্ট করেছি বিয়ে না করে।
বলে ভদ্রমহিলা আমার দিকে তাকালেন।
এমনি করে দু একটা টুকরো কথা বলতে না বলতেই আমরা বুরবন স্ট্রীটে পৌঁছে গেলাম।
মিস্টার গিল্‌স বললেন : এইখানেই নেমে পড়া যাক, কী বলো ?
কোনো উত্তর না দিয়ে বেটি নেমে পড়লেন। আমিও নামলাম। সকলের শেষে মিস্টার গিল্‌স নেমে ভাড়া মিটিয়ে দিলেন।

আলোয় ঝলমল করছে বুরবন স্ট্রীট, আর সঙ্গীতের শব্দে উচ্চকিত হয়ে আছে। মুহূর্তের মধ্যে মিস্টার গিল্‌সের মেজাজ বদলে গেল। বেটির দিকে তাকিয়ে বললেন: এত জায়গা থাকতে এখানে কেন এসেছি বুঝছো তো!

বেটি তখন একটা ক্লাবের খোলা দরজা দিয়ে ভিতরটা দেখছিলেন, বলে উঠলেন: দেখ দেখ, গায়ে এক টুকরোও কাপড় নেই।

ভদ্রলোকের সঙ্গে আমিও তাকালাম ভিতরের দিকে, আর তখনই লজ্জায় চোখ ফিরিয়ে নিলাম। নানা বয়সের একদল পুরুষ ভিতরে বসে মদ খাচ্ছে, আর তাদের সামনে এক নগ্ন মেয়ে নানা রকমের ভঙ্গিতে নাচছে এধার থেকে ওধারে। পিছনের আয়নায় তার ছায়া দেখেই আমি ভয় পেয়ে গেলাম। মেয়েরা যে প্রায়-নগ্ন দেহে একদল পুরুষের লুব্ধ দৃষ্টির সামনে এমন করে নাচতে পারে, এ আমাদের স্বপ্নেরও অতীত। ভয়ে আমি পিছিয়ে এসেছিলাম। আর বেটি সোৎসাহে দরজা দিয়ে ঢোকবার চেষ্টা করতেই মিস্টার গিল্‌স তাঁর হাত ধরে টেনে আনলেন।

বেটি বিরক্ত হয়ে মিস্টার গিল্‌সের মুখের দিকে তাকালেন। আর মিস্টার গিল্‌স বললেন একটু সবুর কর না। কয়েকটা জায়গা দেখি, তারপরে এক জায়গায় ঢোকা যাবে।

বেটি এ প্রস্তাব হাসিমুখেই মেনে নিলেন দেখে মিস্টার গিল্‌স আমার দিকে ফিরে বললেন: ঠিক বলি নি?

ভদ্রতার খাতিরে আমি বললাম: হ্যাঁ।

একটুখানি এগোতেই পথের ধারে একটি রোগা মেয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। বিবর্ণ ফ্রক পরে খালি পায়ে দাঁড়িয়ে সাময়িক পত্র বিক্রি করছে। একখানা পত্রিকা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো: নাও না একখানা!

বড় করুণ সুর, বড় ক্লান্ত অবসন্ন। কেন জানি না, আমাদের দেশের অসহায় মেয়েদের কথা মনে পড়ে গেল। আমি দাঁড়িয়ে পকেটে হাত দেবার উদ্যোগ করতেই মিস্টার গিল্‌স আমার হাত ধরে টেনে বললেন: এ মেয়েটার কাছে তুমি দাঁড়াচ্ছ কেন! এসো না আমার সঙ্গে, কলেজের একটা জলি মেয়ে তুমি পেয়ে যাবে।

ভদ্রলোকের হাতের টানে আমাকে এগিয়ে যেতে হলো। আর আমি তাঁর সঙ্গে আসছি দেখে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেন। অনেক অভিভাবকহীন মেয়ে এই শহরে নিজে রোজগার করে কলেজে পড়ছে। একটা অ্যাপার্ট-মেণ্ট ভাড়া নিয়েছে। দিনে কলেজে পড়ে। আর রাতে ডিনারের পরে এই বুরবন স্ট্রীটে চলে আসে।

এইখানে!

আরে যা ভাবছ তা নয়, এই সব নাইট ক্লাবে তারা কাজ করে না, ক্যাবারে নাচেও তাদের দেখতে পাবে না।

তবে?

ভদ্রলোক আমার হাত আবার টেনে ধরলেন। ফিরে দেখলাম যে বেটি আবার একটা ক্লাবের দরজায় দাঁড়িয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে ভিতরের দৃশ্য দেখছেন। কতকটা একই রকমের দৃশ্য। কিন্তু তফাৎ দেখলাম বাইরে। ক্লাবের দরজার সামনে একটা লোক একজন যুবকের সঙ্গে কী সব কথা-বার্তা বলেই মুখের ভিতরে আঙুল পুরে সিটি দিলো। আর পরক্ষণেই একটি মেয়ে এসে উপস্থিত হলো বাইরে। কতকটা ভেতরের নৃত্যরতা মেয়ের মতোই বেশ বাস। তার সঙ্গে কী কথাবার্তা হলো বুঝতে পারলাম না। মেয়েটি একটা মুখভঙ্গি করেই ভিতরে চলে গেল।

আমি মিস্টার গিল্‌সের মুখের দিকে তাকালাম। কিন্তু মনে হলো যে তিনিও ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেন নি। কিন্তু তবু বললেন: বোধহয় দরে বনলো না।

আশ্চর্য হয়ে আমি বললাম: এ দেশেও দরাদরি হয়!

কেন হবে না!

বললাম: দরাদরি তো সেই সব দেশেই হয় যেখানে টাকার অভাব আছে।

গম্ভীর ভাবে মিস্টার গিল্‌স বললেন: এখানকার খদ্দেররা নানা দেশ থেকে আসে।

বেটি যে আমাদের অলক্ষিতে ভিতরে ঢুকে পড়েছিলেন, আমরা তা দেখতে

পাই নি। ক্ষণকাল পরেই মিস্টার গিল্‌সকেও আর পাশে দেখতে পেলাম না। তিনিও যে বেটির অন্বেষণে ভিতরে ঢুকেছেন, তাতে আমার সন্দেহ রইলো না।
কিন্তু কী আশ্চর্য এই সব মানুষ! এই বয়সেও মত্ততা দূর হলো না! এর পরেই আমার আর একটি কথা মনে এলো। এই যে যুবতী মেয়েরা আজ ঘরের ভিতরে নগ্ন হয়ে নাচছে, আর পুরুষের মনোরঞ্জনের জন্য বেরিয়ে আসছে বাইরে, এরাও তো একদিন বুড়ো হবে। তখন কি এরাও বেটির মতো আবার এখানে এই সব দৃশ্য দেখতে ফিরে ফিরে আসবে!
খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের কথা আমার মনে পড়ে গেল। আমাদের দেশে যেমন পাত্র পাত্রী চাই বলে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, এ দেশে তেমনি সঙ্গী চাই বলে বিজ্ঞাপন ছাপা হচ্ছে। শুনেছি মেয়েরাই বেশি বিজ্ঞাপন দিচ্ছে নিজেদের বয়স উল্লেখ করে। গুণের কথা বলছে, অনেক সময় বিয়ে করতেও আপত্তি নেই বলছে। এই ভাবেই তো বেটির সঙ্গে লিভিং টুগেদারের ব্যবস্থা করেছেন মিস্টার গিল্‌স। এখন ভাবছেন. বিয়ে করবেন তারা। হলেই ভালো। তাহলে আবার তাঁদের সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিতে হবে না।

বুরবন স্ট্রীট ধরে আমি তখন এগিয়ে যাচ্ছিলাম। ডিক্সিল্যাণ্ড জাজের শব্দ পাচ্ছি। ক্যাবারে জমে উঠেছে। আর ক্লাবে মদ খাওয়া চলেছে স্ত্রী-পুরুষের। মনে হচ্ছিল যে এই শহরে এসে ভালই করেছি। এ দৃশ্য দেখারও প্রয়োজন ছিল। সব কিছু নিজের চোখে না দেখলে নতুন দেশ দেখা সম্পূর্ণ হতো না।
হঠাৎ আমাকে থমকে দাঁড়াতে হলো। সেই ভারতীয় ভদ্রলোক না? ইনিই তো আমাকে এই শহরে আসবার পরামর্শ দিয়েছিলেন! নিঃসন্দেহ হতেই আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাচ্ছিলাম তাঁকে ধরবার জন্য। কিন্তু পরমুহূর্তেই তাঁর পাশে একটি মেয়েকে দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়ালাম। খুব কাছে ছিলেন তিনি। তাঁদের কথাবার্তাও শুনতে পেলাম। মেয়েটি হাসিমুখে নমস্কার করলো তাঁকে, বললো: আমার অ্যাপার্টমেণ্টে আজ আসছ তো?

ভদ্রলোক একটু আশ্চর্য হয়ে বললেন : আমাকে চেনো নাকি?

এর উত্তর না দিয়ে মেয়েটি শুধু হাসলো।

আর ভদ্রলোক তখনই তার হাত ধরে বললেন : চলো।

বলে দু'জনেই অন্য ধারে এগিয়ে গেলেন। আমাকে দেখতে পেলেন না বলে আমি একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম।

এই ভদ্রলোকের সঙ্গে কোথায় আমার পরিচয় হয়েছিল, মনে করবার চেষ্টা করলাম। কোনো লব্ধপ্রতিষ্ঠ কোম্পানীর দপ্তরেই বোধহয় পরিচয় হয়েছিল। কোনো ভারতীয় কোম্পানির একজন পদস্থ কর্মচারী, কোম্পানির কাজেই আসেন এ দেশে, কোম্পানির খরচেই থাকেন। ভদ্রলোকের বয়স হয়েছে যথেষ্ট, কিন্তু যে মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন, তার কচি বয়েস। মিস্টার গিল্‌স বোধহয় এদেরই বলেন কলেজের ছাত্রী।

আমি আর দেরি করলাম না, পা চালিয়ে দিলাম নিজের হোটেলের দিকে। যে দেশ থেকে এসেছি, সেই দেশের কথা আমার মনে পড়লো। আমাদের গরীব দেশের কথা।

বুরবন স্ট্রীট পেরিয়ে যেতেই আমি আবার ভিক্টরকে দেখতে পেলাম। একটা ছোট রেস্তোরাঁ থেকে সে বার হচ্ছিল। আমাকে চিনতে পেরেই বলে উঠলো : এত তাড়াতাড়ি তুমি ফিরলে?

বললাম : দেরি করার মতো কোনো কাজ পেলাম না।

সে কি!

বললাম : আমরা গরিব দেশের লোক। এ রকম মত্ততা আমাদের জন্যে নয়।

ভিক্টর আমার চোখের দিকে তাকালো গভীর দৃষ্টিতে। তারপরে বললো : আমরাও গরিবের প্রতিনিধি। কিন্তু দেশটা গরিবের নয় বলে আমাদের কোনো সান্ত্বনা নেই।

আমাদের কি কোনো সান্ত্বনা আছে! কিন্তু এ কথা আমি তাকে বলতে পারলাম না। শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস উঠলো বুকের ভিতর থেকে।

১৫

ছেলেবেলায় ভূগোলের বইএ আমেরিকার গ্র্যাণ্ড কেনিয়ান সম্বন্ধে যা পড়েছিলাম, তার কিছুই আমার মনে ছিল না। এ দেশে এসে পৌঁছবার পরেও কিছু মনে পড়ে নি। কোথায় কার কাছে এ জায়গার কথা নতুন করে শুনলনাম, তাও মনে পড়ছে না। শুধু এইটুকুই মনে পড়ছে যে লস এঞ্জেলসে যাবার পথে অ্যারিজোনার গ্র্যাণ্ড কেনিয়ান যেন অবশ্য দেখে যাই। আমাকে এই উপদেশ দিয়েছিলেন এ দেশেরই কোনো সদাশয় বন্ধু।

অ্যারিজোনা একটি স্টেটের নাম। ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট তার পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে। স্যান ফ্রান্সিস্কো এই স্টেটের প্রধান শহর উত্তরের দিকে, আর দক্ষিণে লস এঞ্জেলস শহর চলচ্চিত্র জগতের স্বর্গ হলিউডের জন্য বিখ্যাত। স্যান ফ্রান্সিস্কোর মতো এ শহরটিও প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে।

অ্যারিজোনার গ্র্যাণ্ড কেনিয়ান সমুদ্রের ধারে নয়। ক্যালিফোর্নিয়া ও অ্যারিজোনা স্টেটের সীমানায় প্রবাহিত হচ্ছে আমেরিকার দ্বিতীয় বৃহত্তম নদী কলরেডো। এই নদীর দু তীরেই গ্র্যাণ্ড কেনিয়ান।

গ্র্যাণ্ড কেনিয়ানকে পাহাড় বলবো, না মালভূমি বলবো, তা জানি না। পাতাল বললেও আপত্তির কোনো কারণ নেই। সত্যি কথা বলতে কি, এ জায়গা না দেখলে কোনো ধারণা করাই সম্ভব নয়।

যিনি আমাকে এই জায়গা দেখার পরামর্শ দিয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে সেখানে গেলে আর একটি উপরি লাভ আছে। আমেরিকায় ইণ্ডিয়ান বলে যারা পরিচিত, তাদেরও দেখতে পাওয়া যায়। কপাল ভালো হলে তাদের নৃত্য গীত উপভোগ করবারও সুযোগ মিলে যায়।

আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের আমরা রেড ইণ্ডিয়ান বলে জানি। গায়ের রঙ

তামাটে লাল। তারাই এ দেশের আদিম অধিবাসী। এখন যারা আমেরিকান নামে পরিচিত, আসলে তারা আমেরিকার লোক নয়। তারা ইউরোপ থেকে এসেছে। ইংরেজদেরই প্রাধান্য বেশি, অন্যান্য দেশের অধিবাসীও আছে। নিগ্রোরাও দলে ভারি। নিউ ইয়র্ক শহরেই নাকি পনেরো লাখ নিগ্রোর বাস। আমেরিকার সব জায়গাতেই তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এ দেশের শতকরা এগারো জন নিগ্রো।

আমি জানতাম না যে এ যাত্রায় একটি নিগ্রো মেয়েকে আমি সঙ্গী হিসেবে পাবো। মেয়েটিই আমাকে জিজ্ঞাসা করলো : তুমি একা?

বললাম : হ্যাঁ, আমি একাই এসেছি।

আমার উত্তর শুনে সে বেশ আশ্চর্য হলো, বললো : আর কেউ সঙ্গে আসে নি?

আমি হেসে বললাম : এ দেশে আমার জানাশুনো তো কেউ নেই।

বান্ধবী?

একেবারে নিঃসঙ্গ আমি।

মেয়েটি বললো : ভারি আশ্চর্য লাগছে।

কেন?

এ দেশের মেয়েরা কোনো পুরুষকে নিঃসঙ্গ দেখতে চায় না। কেউ একা দেখলেই তার পাশে এসে বসে। গল্প করে। ভাব করতেও দ্বিধা করে না।

বললাম : আমার আর একটা অভাব আছে।

কিসের অভাব?

বলে মেয়েটি আমার মুখের দিকে তাকালো।

গম্ভীর ভাবে বললাম : পয়সার।

এ কথা বোধহয় তার বিশ্বাস হলো না। তাই নিঃশব্দে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

বললাম : আমি সত্যি কথাই বলছি। দেশ থেকে পয়সা আনতে পারি নি। গরিব দেশ, আমিও গরিব। এখানে এসে যা পাচ্ছি, তা বেপরোয়া খরচ করবার সাহস নেই। দেশের মান বাঁচিয়ে দেশে ফিরতে হবে তো!

মেয়েটি নিজের পরিচয় দিলো। নাম জুডিথ। লেখাপড়া শেষ করে চাকরির চেষ্টা করছে, কিন্তু পছন্দ মতো কাজ পাচ্ছে না। বললো না যে কালো মেয়ের কাজ পেতে অসুবিধা হয়। কিন্তু আমার মনে হলো যে এ কথা স্বীকার করতে সে চাইলো না। বললো : এ দেশে কাজের তো অভাব নেই, কাজের লোকেরই অভাব। তাই একটা না একটা কাজ জুটেই যায়।

জিজ্ঞাসা করলাম : এখন কোথায় চলেছ ?

জুডিথ হেসে বললো : গ্র্যাণ্ড কেনিয়ান দেখতে যাচ্ছি।

একা ?

না।

তোমার সঙ্গে তো কোনো সঙ্গী দেখছি না !

এয়ারপোর্টে দেখতে পাবে।

আমার মনে হলো যে কৌতূহল চেপে রাখার চেয়ে তা প্রকাশ করাই ভালো। তাই বললাম : গ্র্যাণ্ড কেনিয়ানে বুঝি তোমার বন্ধু আছে ?

জুডিথ হেসে বললো : না। সানফ্রান্সিস্কো থেকে সে এসেছে। কয়েকটা দিন আমরা একসঙ্গে কাটাবো।

খুব ভালো কথা।

কেন ?

বলে জুডিথ আমার মুখের দিকে তাকালো।

এ রকম একটা প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। তবু একটা উত্তর দিতে হলো। বললাম : মাঝে মাঝে ছুটি উপভোগ করা স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই প্রয়োজন। আমাদের দেশে—

বলেই আমি থেমে গিয়েছিলাম। কিন্তু জুডিথ আমাকে থামতে দিলো না। বললো : বলো।

বললাম : এ রকম ভাবে ছুটি উপভোগ করতে আমরা শিখি নি। নানা রকমের বাধা আছে আমাদের।

কি বাধা ?

প্রথম বাধা হলো পয়সার। আর দ্বিতীয় বাধাও কম নয়। সে হলো সামা-

জিক বাধা। ছেলেমেয়ের বন্ধুতা এখনও আমাদের দেশে খুব ভালো চোখে দেখা হয় না। মেয়েরা একা বেরোতে এখনও ভয় পায়।

জুডিথ আশ্চর্য হলো আমার কথা শুনে, বললো : এ যুগেও মেয়েরা পিছিয়ে আছে!

বললাম : সব মেয়ে পিছিয়ে নেই। অনেক মেয়েই পুরুষদের চেয়ে এগিয়ে গেছে। আবার পিছিয়ে আছে, এমন মেয়েও অনেক।

জুডিথ বললো : কিছু মনে কোরো না, ধর্ম নিয়ে কি তোমাদের মধ্যে খুব বেশি বিবাদ?

আচমকা এ রকম একটা প্রশ্নের জবাব দিতে হবে, এ আমি ভাবতে পারি নি। কিন্তু একটা উত্তর না দিলে ব্যাপারটা অশোভন দেখাবে বলে বললাম : এর উত্তরও ঠিক আগের মতো।

কেমন?

বললাম : জনসাধারণের ধর্ম সম্বন্ধে কোনো মতামত নেই। গোঁড়ামি আছে কিছু-সম্প্রদায়ের মধ্যে। কিন্তু আর বেশিদিন তারা গোঁড়ামি বজায় রাখতে পারবে না।

তারপরেই বললাম : তোমাদের সম্বন্ধে কিছু বলো।

জুডিথ একবার তার নিজের চারিদিকে তাকিয়ে দেখলো। তারপরে বললো : এ দেশে সাদা-কালোর বিবাদ। সরকার মুখে যাই বলুক, সমাজে এই বিবাদ সহজে মিটবে না।

আমি বললাম : এই বিবাদ তো আফ্রিকায় আছে বলে শুনেছি।

জুডিথ বললো : আমেরিকাতেও আছে। তার মাঝে মাঝেই একটা ভয়াবহ আকার ধারণ করে। থেমেও যায় সাময়িকভাবে। খবরের কাগজে তোমরা পড় না?

এ রকমের কোনো খবর পড়েছি বলে আমি মনে করতে পারলাম না। তাই কোনো উত্তর দিলাম না

জুডিথ খানিকটা লজ্জিতভাবে বললো : যাক এ সব কথা।

এর পরেই আমার মনে হলো যে সাদা-কালোর বিবাদের কথা আমি

বোধহয় কোথাও শুনেছি, বা পড়েছি কোনো সাময়িক পত্রে। কালো মেয়ে বিয়ে করার দুর্ভোগের কথা, বা সাদা ছেলেকে বিয়ে করে কালো মেয়ের নিগ্রহের কথা। কিন্তু জুডিথের সঙ্গে এইতো পরিচয় হলো! এসব কথা কি এত তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করা যায়! তাই আমি মনের কৌতূহল দমন করে ফেললাম।

খানিকক্ষণ নীরবে থাকবার পরে জুডিথ আমাকে জিজ্ঞাসা করলো : তুমি কি এ দেশে বেড়াতে এসেছ?

বললাম : না।

তবে কি পড়তে এসেছিলে?

তাও না।

তবে?

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছু বলবার জন্যে আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। কাজ প্রায় শেষ হয়ে গেছে।

জুডিথ অকপটে বললো : ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমাদের কোনো ধারণা নেই বললেই হয়।

বললাম : তাতে কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু কিছু লোকের মধ্যে যে ধারণা দেখেছি, তাতে বেশ কষ্ট পেয়েছি।

কেন?

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁরা ভুল ধারণা নিয়ে ফিরেছেন, আর তারই স্বপক্ষে দলিল এনেছেন সঙ্গে। তাই প্রচার করে এ দেশের অনেকেরই মনে সেই সব ভুল কথা সঞ্চারিত করে দিচ্ছেন।

জুডিথ বললো : একটা উদাহরণ দিয়ে আমাকে বুঝিয়ে দাও।

উদাহরণ দিতে গিয়ে আমি বিপদে পড়লাম। সহসা কিছু মনে পড়ছিল না! হঠাৎ মনে পড়ে গেল কোনো এক মন্দির গাত্রের অশ্লীল মূর্তির কথা। জুডিথের মতো বয়সের মেয়ের কাছে এ কথা বলা কিছু অশোভন হতে পারে জেনেও বললাম : ভারতবর্ষের দু একটা প্রাচীন মন্দিরের গায়ে কিছু অশ্লীল মূর্তি উৎকীর্ণ আছে। সচরাচর সে সব মূর্তি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ

করে না। কেউ দেখিয়ে দিলেই আমরা দেখতে পাই, আর দেখতে পেলেই সরে যাই সেখান থেকে। এসব মন্দির তৈরি হয়েছে পাঁচ-সাত শো বছর এমনকি হাজার বছরেরও বেশি আগে। বিদেশীরা এইসব মূর্তির ফটোগ্রাফ নিতে চান বলে গাইডরা তা দেখিয়ে দেয় পয়সার লোভে। তাঁরা সেই সব ছবি তুলেই ফিরে যান, কিন্তু সেই মন্দিরের সামগ্রিক রূপের বা স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষের কোনো পরিচয় সংগ্রহের চেষ্টা করেন না। এসব দেশের মানুষ হয়তো সেই সব ছবি দেখে ভারতবাসীকে অসভ্য ভাবে।

জুডিথ এ কথা মেনে নিয়ে বললো : এসব ছবির কিছু কিছু আমরা দেখেছি। তারই সঙ্গে দেখেছি ভারতবাসীর জীবনযাত্রার এমন সব ছবি যে দেশটাকে আমাদের আধা সভ্য বলে মনে হয়েছে।

আমি বললাম : শুধু তাই নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এ দেশ থেকে যাঁরা ভারতে গিয়েছিলেন ইংরেজের পক্ষে যুদ্ধ করতে, তাঁদের ছ'জনের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে এখানে। ভারতকে এখনও তাঁরা চোরের দেশ বলে মনে করেন।

কেন ?

কিছু বলবার নেই, ছ'জনেরই অভিজ্ঞতার কথা। তবে এ কথাও স্বীকার করেছেন যে অত্যন্ত নোংরা পরিবেশে দেশী মদ খেয়ে বেহুঁস হয়ে যখন তাঁরা রাত কাটিয়েছেন রাস্তায়, তখনই তাঁদের চুরি হয়েছে।

ছি-ছি !

বলে জুডিথ নাক সেঁটকালো।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম : এ আমাদেরই দুর্ভাগ্য !

কেন ?

বললাম : এ দেশেও তো অনেক ভারতীয় আছেন, প্রতি বছর নানা কাজে আসেনও অনেকে। তাঁরা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত। দেশের সম্বন্ধে তাঁদের কোনো গর্ব বোধ নেই, ভারতের প্রকৃত রূপের প্রচারেও কোনো আগ্রহ নেই তাঁদের।

জুডিথ বললো : শুনেছি, অনেক ট্যুরিস্ট ভারতে নানা রকমের কষ্ট পেয়ে

পালিয়ে এসেছে।

কেন?

এর নানা কারণ। কেউ বলে, ভালো হোটেল নেই, মদ সব জায়গায় পাওয়া যায় না। অথচ খাবার জল নাকি দূষিত, খেলেই পেটের গোলমাল হয়। তারপর ভিখিরিদের উপদ্রব সর্বত্র, পয়সার জন্যে তারা নাকি মেয়েদের ফ্রক ধরে টানে।'

লজ্জিত ভাবে আমি বললাম : এ সব কথা আমার জানা নেই।

কিন্তু জুডিথ থামলো না। বললো : এ কথাও শুনেছি যে বিদেশী দেখলেই ভারতীয়রা তাদের বড়লোক ভাবে এবং নানা ভাবে ঠকাতে চেষ্টা করে তাদের। এই সব অত্যাচার যখন অসহ্য মনে হয়, তখনই তারা পালিয়ে আসে।

বললাম : এ সব যদি সত্যি হয় তো খুবই দুঃখের কথা। কিন্তু আমার মনে হয় যে এ সমস্তই অতিরঞ্জিত।

এবারে কিছু না বলে জুডিথ আমার মুখের দিকে তাকালো।

বললাম : ভারতে হোটেলের সংখ্যা হয়তো কম। কিন্তু বড় বড় শহরে এত ভালো হোটেল আছে যে আমরা সে সব হোটেলের ধারে ঘেঁষতেও সাহস পাইনে। আর ভালো মন্দ মদেরও অভাব নেই। দু একটি জায়গায় ছাড়া সর্বত্র মদ পাওয়া যায়। যেখানে প্রকাশ্যে বিক্রি হয় না, সেখানেও লোকে লুকিয়ে খায়। আর খাবার জল! আমরা তো সেই জল খেয়েই বেঁচে আছি! তবে গরিব দেশে ভিখিরি থাকবেই। তারা বেশি সংখ্যায় থাকে তীর্থস্থানে, মন্দিরের সামনের রাস্তায়। দান করা আমরা পুণ্যের কাজ মনে করি বলেই তীর্থযাত্রীদের দানেই তাদের জীবন চলে।

একটু থেমে বললাম : বিদেশীরা মন্দিরের অশ্লীল ছবি তুলতে কিংবা অন্য কোনো কৌতূহল নিয়ে সেসব জায়গায় যায়। আর—কিছু মনে কোরো না—পয়সার লোভ দেখিয়ে অর্ধনগ্ন ভিখিরি মেয়ের ছবি তোলে। এমন কি বুকের কাপড় কিছু অসংবৃত করতেও বলে অনেকে। তারপর যদি সাহেবের কাছে মনোমত পয়সা না পেয়ে মেম সাহেবের ফ্রক ধরে টানে, তাহলে

কি আপত্তি করার কিছু আছে ?

জুডিথের ভ্রূ কুঁচকে গেল। বললো : দেখেছি এই রকমের ছবি। এই সব ছবি দেখেই ভারতের সম্বন্ধে আমাদের পরিচয় হচ্ছে।

দেখলাম যে সেও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

১৬

যথাসময়ে আমরা গ্র্যাণ্ড কেনিয়ান গ্রামে এসে পৌঁছলাম। জুডিথের বন্ধু একটা সাদা ছেলে। নাম তার জেম্‌স। নিজের গাড়িতে করে সে আমাদের একটা বড় হোটেলে নিয়ে গেল। হোটেলের নাম এল্ টোভার। মস্ত বড় পাথরের বাড়ি, সামনে দু চালের ছাদ। দোতলার ছাদও একই রকম। পুরনো পদ্ধতিতে তৈরি এই বাড়ির সঙ্গে আমাদের দেশের ঘরবাড়ির যেন কোথায় একটা মিল আছে। হোটেলের সামনে কয়েকটি বড় গাছ, আর এপাশে ওপাশে বড় বড় ক্যাক্‌টাসের ঝোপ। গাড়ি থেকে নেমে আমরা ভিতরে চলে গেলাম।

জেম্‌স আগে ভাগে এসে তার ঘর বুক করে রেখেছিল। জুডিথ তারই ঘরে থাকবে। জুডিথের সঙ্গে যে আমি আসব, এ কথা সে জানতো না। জানলে সে হয়তো আর একখানা ঘর নিত জুডিথের জন্য। একটু ইতস্তত করে আমাকে বললো : আমি একটা বড় ঘর পছন্দ করেছি। ইচ্ছা করলে তুমি আমার সঙ্গে থাকতে পার।

এখানকার সামাজিক নিয়ম কানুন ভালো না জেনেও আমি বলেছিলাম : জুডিথ তোমার সঙ্গে থাক। আমি একটা ছোট ঘর নিচ্ছি।

জুডিথ লজ্জা পেয়েছিল কিনা জানি না। তার মুখ দেখে আমি কিছু বুঝতে পারি নি। কিন্তু সে কোনো আপত্তি করে নি। ব্যাপারটা এইখানেই মিটে গিয়েছিল।

পরে আমি জেনেছিলাম যে এ দেশে ছেলেমেয়েদের লিভিং টুগেদার বলে একটা কথা আছে। মানে দু'জনে একসঙ্গে থাকা। ছেলেমেয়েরা বিয়ের

আগেও স্বামী স্ত্রীর মতো থাকে, পরে ইচ্ছা হলে বিয়ে করে, ইচ্ছে না হলে করে না। কোনোও বাধ্যবাধকতা নেই। সমাজে এই ব্যবস্থা নিন্দনীয়ও নয়। শতকরা নব্বুই জনের নাকি এ দেশে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। পরে তারা এইভাবে কিছুদিন থাকতেই ভালবাসে। তারপরে বিয়ের কথা। বার্ধক্যেও লিভিং টুগেদার একটা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। ওল্ড হোমে বুড়ো-বুড়িদের আজকাল এত বেশি খরচ দিতে হয় যে এইভাবে বসবাসই বেশি সুবিধার বলে মনে করা হচ্ছে। নিউ অর্লিয়ান্সেই এ কথা আমি জেনে এসেছি।

কফি খেতে খেতে জেম্স আমাকে গ্র্যাণ্ড কেনিয়ানের সম্বন্ধে অনেক কথা বললো। এর আগেও সে এখানে এসেছে। কিন্তু জুডিথ এর আগে এখানে আসে নি বলে কয়েক দিনের ছুটি কাটাতে এসেছে তারা।

জেম্স বললো : এ একটা অদ্ভুত দৃশ্য! নিজের চোখে না দেখলে তুমি কোনো ধারণাই করতে পারবে না। অনেকে একে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য বলে, কিন্তু আমি বলি পৃথিবীর প্রথম আশ্চর্য। আমি কেন, যে দেখে সে-ই এই কথা বলে।

তারপরেই বললো : বাইরে বেরোবার আগে ব্যাপারটা তোমাদের একটু বুঝিয়ে বলি।

বলে ঘরে গিয়ে দু একখানা বই নিয়ে এসে বললো : তোমাদের বোঝাবার জন্যেই এই বই সংগ্রহ করে এনেছি।

তারপরে সরল ভাবে বুঝিয়ে দিলো গ্র্যাণ্ড কেনিয়ানের কথা।

পথে আসতে আসতে বুঝতে পেরেছিলাম যে আমরা একটা বিরাট মাল-ভূমির উপরে উঠে এসেছি। জেম্স বললো : ঠিক কথা। কিন্তু আমরা যা দেখব, তা মালভূমি নয়। আমরা দেখব গভীর খাদ। বিচিত্র আকার ও আকৃতির সুন্দর দৃশ্য, মন্দিরের মতো অপরূপ কারুকার্য করা পাথরও দেখব।

পাহাড় ও নদীর খাদ যে কত বিশাল, জেম্স আমাদের সে কথাও বললো। লম্বায় দুশো সতেরো মাইল, আর চার থেকে আঠারো মাইল চওড়া

নিচের দিকে গভীর হবে প্রায় এক মাইল। কেমন করে এই বিরাট খাদের সৃষ্টি হয়েছিল, সে কথাও শুনলাম। কলরেডো নদী প্রবাহিত হয়েছে এই খাদের মধ্য দিয়ে। কলরেডো আমাদের গঙ্গা বা ব্রহ্মপুত্রের চেয়েও লম্বা নদী। দু হাজার মাইল লম্বা। কয়েকটি উপনদী এসে মিলেছে তার সঙ্গে। এই সব নদী তাদের স্রোতের খর ধারায় মালভূমি কেটে কেটে সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হয়েছে।

আশ্চর্য হয়ে আমি বললাম : এক মাইল গভীর হওয়া কি সম্ভব ?

জেম্‌স বললো : সামনে যদি পাহাড়ের বাধা আসে তাহলে তাকে সেই পাহাড় সুড়ঙ্গের মতো কেটে কেটেই এগোতে হবে।

পাহাড়কে বেষ্টন করেও তো প্রবাহিত হতে পারতো !

সামনের বাধা অতিক্রম করাই প্রকৃতির ধর্ম।

কিন্তু চার থেকে আঠারো মাইল চওড়া হলো কী করে ?

জেম্‌স বললো : সে কথা তুমি কোনো বৈজ্ঞানিককে জিজ্ঞেস কোরো। এ তো আর একদিনে তৈরি হয় নি ! লক্ষ লক্ষ বছর ধরে এই আকার ধারণ করেছে। শুধু নদী নয়, বৃষ্টি বাদল বাতাস ও বরফ এই বিরাট কাজে সাহায্য করেছে নদীকে। এখনও এই অঞ্চলের পরিবর্তন হচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে যে পরিবর্তন হবে, আজ আমরা তা অনুমান করতেও পারবো না।

তারপরে সে আমাকে বললো যে এখানে আসার তিনটি পথ আছে। সাণ্টা ফি রোপওয়ে এসেছে দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে। আর দুটি শড়ক পথের একটি এসেছে দক্ষিণ থেকে, অন্যটি পূর্ব দিক থেকে। মোটরে এই হোটেল পর্যন্ত আসা যায়, আর পূর্ব প্রান্তে ওয়াচ টাওয়ার পর্যন্ত যাওয়া যায় মোটরে বা বাসে। অন্যত্র-ঘোড়ায় চড়ে যেতে হয়। ন্যাশনাল পার্কে ঘোড়ায় চড়ে বেড়ানো খুব আনন্দের ব্যাপার।

তারপরেই জিজ্ঞাসা করলো : ঘোড়ায় চড়া জানো তো ?

আমি অকপটে স্বীকার করলাম : জানি না।

সেকি ! তোমাদের দেশে পাহাড় নেই ?

বললাম : পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাহাড় হিমালয় তো আমাদের দেশেই !

তবে ?

বললাম : যত দূর ট্রেন যায় তত দূর আমরা ট্রেনে যাই, তারপর হাঁটি।

জেম্‌স আশ্চর্য হয়ে বললো : ভারতীয়রা ঘোড়ায় চড়ে না ?

হেসে বললাম : তা কেন হবে ! ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করতে জানে ভারতীয়রা, পোলো খেলতেও পারে। কিন্তু আমি পারি না। আমার ভয় করে।

জেম্‌স বললো : ঠিক আছে। এইখানে তোমায় ঘোড়ায় চড়া শেখাবো।

সর্বনাশ ! আমাকে তাহলে আর দেশে ফিরতে হবে না।

জেম্‌সের সঙ্গে জুডিথও হেসে উঠলো।

কফি শেষ করে আমরা উঠে পড়লাম। গাড়িতে উঠবার আগে জেম্‌স আমাদের একটা মানচিত্র দেখিয়ে সব বুঝিয়ে দিলো। গ্র্যাণ্ড কেনিয়ান দেখবার অনেকগুলো ভালো জায়গা আছে। দক্ষিণে দাঁড়িয়ে উত্তর দিকে আমরা সব দেখতে পাব। আমাদের হোটেলের পিছন দিকেই হলো ব্রাইট এঞ্জেল ট্রেইল। বাঁ দিকে সোজা গেলে প্লেটো পয়েন্ট, আর ডান দিকে আঁকা-বাঁকা পথ ধরে এগিয়ে গেলে হোপি হাউস।

জেম্‌স হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞেস করে বসলো : হোপি জানো ?

বললাম : না।

জেম্‌স বললো : একটা ইণ্ডিয়ান ট্রাইব।

আমি জানি যে সে কোনো ভারতীয় আদিবাসীর কথা বলছে না, সে বলছে রেড ইণ্ডিয়ান বা আমেরিকান ইণ্ডিয়ানের কথা। এর পরেই সে বললো : এই অঞ্চলে পাঁচটি ইণ্ডিয়ান ট্রাইব দেখতে পাওয়া যায়—তাদের নাম হলো হোপি, নাভাডো, প্যায়ুট, হুয়াল পাই ও হাভাসুপাই।

এ সব নাম আমার জানা ছিল না। বেশিক্ষণ মনে রাখতেও পারবো না। তাই কোনো কথা বললাম না।

জেম্‌স বললো : কোনো চিন্তা কোরো না, ইণ্ডিয়ানদের নাচ তোমাদের দেখিয়ে দেবো—ঈগল ডান্স আর হোপি ডান্স।

আমি বললাম : ওরা বুঝি নাচতে ভালবাসে ?

তা বাসে বৈকি !

জুডিথ বললো : আমার কিন্তু ওদের দেখলে ভয় করে।

কেন ?

বলে আমি তার মুখের দিকে তাকালাম।

জুডিথ বললো : কী রকম লাল চেহারা। আর চোখগুলো যেন—

জেম্‌স তাকে বাধা দিয়ে বললো : ভারি নিষ্ঠুর। কাউকে একা পেলে হয় তো মেরেই ফেলবে।

সত্যি !

বলে চোখ বড় বড় করে জুডিথ জেম্‌সের মুখের দিকে তাকালো।

জেম্‌স বললো : ওদের সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনেছি। মানুষকে মরতে দেখলে ওরা ভারি আনন্দ পায়। সাধারণ মানুষ ওদের মতো নিষ্ঠুর হয় না।

জুডিথ বললো : তবে ওদের নাচ দেখে দরকার নেই।

রেড ইণ্ডিয়ানদের সম্বন্ধেআমার কিছু জানা ছিল না। আমি তাই নিঃশব্দে জেম্‌সের কথা মেনে নিলাম। বললাম: এইবারে গ্র্যাণ্ড কেনিয়ানের কথা বলো।

জেম্‌স বললো : হোটেল থেকে বেরিয়ে আমরা যদি পূর্ব দিকে যাই, তাহলে প্রথমে পাবো ব্রাইট এঞ্জেল লজ, তারপর হোপি ফায়ার লুক আউট ও পাওয়েল মেমোরিয়াল। আর পথের শেষে হার্মিট্‌স রেস্ট।

পাওয়েল কে ?

প্রশ্ন করলো জুডিথ। আর জেম্‌স উত্তর দিলো : গ্র্যাণ্ড কেনিয়ানের এক-জন আবিষ্কারক। এ জায়গার খবর এ দিকের অধিবাসী ছাড়া আর কেউ তো জানতো না। চারশো বছরেরও বেশি আগে এক দল সাদা মানুষ এসে জায়গাটা দেখে গিয়েছিল। তারপর কে এসেছে, আর কে দেখেছে, তার কোনো হিসেব নেই। এক শো বছর আগে মেজর পাওয়েল এসে সত্যিকার আবিষ্কার করলো গ্র্যাণ্ড কেনিয়ান। ছোট ছোট নৌকোয় চেপে কলরেডো নদী বেয়ে তারা এগিয়েছিল। কিছু লোক মরেছিল বলে শুনেছি। তার পর এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে জিওলজিক্যাল সার্ভে এটি পুরোপুরি আবিষ্কার করেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পরে এটিকে

ন্যাশনাল পার্কে পরিণত করা হয়েছে।

তখন আমরা জেম্‌সের গাড়িতে উঠে বসেছি। জেম্‌স বললো : আগে ডেসার্ট ভিউ এ চলো।

বলে হোটেল থেকে বেরিয়ে সদর রাস্তায় এসে পূর্ব দিকের পথ ধরলো। বাঁ হাতে ভিজিটার সেণ্টার ও ডান হাতে সার্ভিস স্টেশন দেখতে পেলাম। জেম্‌স বললো : দক্ষিণে ঐ যে বাড়িগুলো দেখছো, ওর নাম ইয়াভা পাই লজ। আর হোটেল থেকে পায়ে হাঁটা পথ ধরে বেরোলে হোপি হাউসের পাশ দিয়ে ইয়াভা পাই পয়েণ্টে পৌঁছতে। তারপরেই মেদার পয়েণ্ট। এই সব পয়েণ্ট থেকে গ্র্যাণ্ড কেনিয়ানের নানা রূপ দেখা যায়।

আরও একটু এগিয়ে দেখতে পেলাম যে দক্ষিণ দিক থেকে একটা রাজপথ এসে আমাদের পথের সঙ্গে মিলেছে। সেই পথটি দেখিয়ে জেম্‌স বললো : এ দিক থেকেই সাউথ এনট্রান্স স্টেশন।

কিন্তু আমরা দক্ষিণের দিকে না গিয়ে সোজা এগিয়ে চললাম। খানিকটা দূরেই বাঁ হাতে একটা পাহাড়ী পথ দেখতে পেলাম। জেম্‌স বললো : এই পথ গেছে কাইবার ট্রেইনের দিকে। পায়ে হাঁটা পথে এখানে আসা যায়। ব্রাইট এঞ্জেল ট্রেইল থেকে একটা সুন্দর জায়গায় পৌঁছনো যায়। রিম থেকে মাইল খানেক নিচে এই জায়গাটি। শুধু সুন্দর বললে ঠিক বোঝা যাবে না, অদ্ভুত সুন্দর। চারিদিকে পাহাড়ে ঘেরা একটি জলাশয়, তার পাশে থাকবার জায়গাও আছে। কাল তোমাদের নিয়ে যাব সেইখানে।

জুডিথ বললো : তোমার গাড়িতে নিয়ে যাবে তো!

জেম্‌স প্রাণ ভরে হেসে বললো : এই পথে যে গাড়ি চলছে, এই তোমার ভাগ্য। বেশির ভাগ জায়গাতেই তোমাকে হেঁটে বা ঘোড়ায় চড়ে যেতে হবে। চার-পাঁচ ফুট চওড়া রাস্তা। এক এক জায়গায় এমন খাড়া যে হাঁটতে দম ফুরিয়ে যাবে।

কথা বলতে বলতেই অনেক দূরে এগিয়ে গেলাম। বাঁ হাতে গ্র্যাণ্ড ভিউ ছাড়িয়ে আরও খানিকটা এগিয়ে মোরান পয়েণ্ট। তারপরে ডান দিকে

টাজিয়ান রুইন ও মিউজিয়ম। এর পরে একটা পথ উঠেছে ওয়াচ টাওয়ারে, অন্য একটা পথ পূর্ব দিকে গেছে ঈস্ট এনট্রান্স স্টেশনে।
জেম্‌স বললো : ছেষট্টি নম্বর হাইওয়ে দু'দিক থেকে এসেছে গ্র্যাণ্ড কেনিয়ানে। এই পথ আমাদের এল্‌ টোভারের কাছে এসে বাঁ দিকে হাভাসুপাই কেনিয়ানের দিকে চলে গেছে। এই পথ আর এক দিক থেকে এসেছে সামনের ওয়াচ টাওয়ারে। ক্যামেরন ব্রিজের ওপর দিয়ে লিট্‌ল কলরেডো নদী পেরিয়ে হোপিদের গ্রামে যাওয়া যায়। আবার উত্তরে লাভাজো ব্রিজের ওপর দিয়ে কলরেডোর ওপারে গ্র্যাণ্ড কেনিয়ানের উত্তরেও পৌঁছনো যায়। এই পথের মাঝখানে কাইবার ন্যাশনাল ফরেস্ট। শুধু দক্ষিণে নয়, উত্তরেও এই বন অনেকদূর প্রসারিত। পেইণ্টেড ডেসার্ট ও পেট্রিফায়েড ফরেস্ট নামে যে অপরূপ জায়গা রয়েছে, তা লিট্‌ল কলরেডো নদীর ওপারে হোপি ভিলেজের পথে। কয়েকদিন থাকলে সে জায়গাও তোমাদের দেখিয়ে আনবো।

দেখতে না দেখতেই আমরা ওয়াচ টাওয়ারের নিচে পৌঁছে গেলাম। ছোট বড় নানা আকারের ইঁটে তৈরি একটা গোল টাওয়ার কয়েক তলার সমান উঁচু। নিচে গাছপালায় খানিকটা জায়গা ঢেকে আছে। পথ অসমতল। গাড়ি থেকে নেমে এই পথেই আমরা উপরে উঠে এলাম।
আমি টাওয়ারের উপরে উঠলাম না। তার গায়ে ছোট ছোট জানালা আছে। আর একেবারে উপরে উঠে দাঁড়াবারও জায়গা আছে। জুডিথকে নিয়ে জেম্‌স উপরে উঠে গেল। আমি নিচে দাঁড়িয়েই সুদূর প্রসারিত গ্র্যাণ্ড কেনিয়ানেব বিশাল রূপ দেখে অভিভূত হয়ে গেলাম। যত দূর দেখা যায়, তত দূর বিস্তৃত একটি বৃক্ষ-লতাহীন অদ্ভুত মালভূমি। পিছনের অংশ মরুভূমির মতো মনে হচ্ছে। তাইতেই এই জায়গার নাম হয়েছে ডেসার্ট ভিউ।
কোকোনিলো ফরেস্টের মধ্য দিয়ে আসতে আসতে কয়েক জায়গাতেই আমরা গ্র্যাণ্ড কেনিয়ানের খণ্ড রূপ দেখতে পেয়েছিলাম। কিন্তু তার এই

বিশাল রূপ এখানেই প্রথম দেখলাম।

জেম্‌স উপর থেকে আমাকে ডাকলো। জুডিথ চেঁচিয়ে বললো : পেইণ্টেড ডেসার্ট দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু আমি উপরে ওঠার সাহস পেলাম না। খানিকক্ষণ আমার জন্যে অপেক্ষা করে দু'জনেই এক সঙ্গে নেমে এলো।

ফেরার তাড়া ছিল আমাদের। একটা অপরূপ অপরিচিত পরিবেশের ভিতর দিয়ে আমরা যে ছাব্বিশ মাইল পথ অতিক্রম করে এসেছিলাম, তা বুঝতে পারি নি। জেম্‌স সে কথা আমাদের জানিয়ে দিলো ফেরার পথে। বললো : যারা এক দিনে এই গ্র্যাণ্ড কেনিয়ান দেখে ফিরে যায়, তারা কিছুই দেখতে পায় না।

কেন?

এই দেখাকে তো দেখা বলে না। এই ডেসার্ট ভিউএ যখন ঝড়ের মেঘ ওঠে, তখন সমস্ত আকাশটা ভায়োলেট রঙ হয়ে যায়। মনে হয় তখন অন্য কোনো গ্র্যাণ্ড কেনিয়ান দেখছি। অন্য পয়েণ্টেও এমনি হয়। সূর্যাস্তের সময় একরকম, চন্দ্রোদয়ের সময় আর এক রকম। বসন্তে তার আর এক রূপ—ফুলে ফুলে এই অঞ্চল তখন অপরূপ হয়ে যায়। সবচেয়ে ভালো লাগে ক্লিফ রোজের বড় বড় গাছগুলি, আর কলরেডো নদীর তীরে পিয়ার ক্যাক্‌টাসের লাল লাল ফুলগুলি। বড় আকারের এত ফুল একসঙ্গে ফুটে থাকে যে দেখে অভিভূত হয়ে যেতে হয়।

এবারে আমরা একটু বেগে ফিরছিলাম। সময় মতো আমাদের হোটেলে পৌঁছতে হবে। তবু আমি বললাম : একবার কলরেডো নদী আর ঐ ফুল আমাদের দেখতে হবে।

জেম্‌স বললো : বিকেল বেলায় দেখাব।

বললাম : সেই ভালো। কাল তাহলে আমি এগিয়ে যেতে পারবো।

জুডিথ আশ্চর্য হয়ে বললো : এত তাড়াতাড়ি ফিরবে?

বললাম : অনেক দিন এ দেশে আছি তো!

হোটেলে পৌঁছেই জেম্স চেঁচিয়ে উঠলো : হায় হ্যারি !

বলে গাড়ির দরজা খুলে লাফিয়ে নেমে তার হাত চেপে ধরলো। কিন্তু হ্যারিকে আমি কতকটা নিরাসক্ত ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। আর তার চোখের দৃষ্টি জুডিথের দিকে নিবদ্ধ। যে কথা হলো তাদের মধ্যে আমি তা শুনতে পেলাম না। যখন কাছে এসে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলো, তখনই জানতে পারলাম যে জেম্সের বন্ধু হ্যারি এসেছে গ্র্যাণ্ড কেনিয়ান দেখতে। কিন্তু তার মনে যে মারাত্মক অভিসন্ধি ছিল, তা আমরা বুঝতেও পারি নি।

লাঞ্চের পরে হ্যারিকে খুব তৎপর দেখলাম। বললো : চলো আজ ফ্যাণ্টম র‍্যাঞ্চের দিকে। ফিরতে কিছু অন্ধকার হবে। তাতে ক্ষতি নেই। সঙ্গে আমার টর্চ আছে।

জেম্স বললো : বেশ ভালো আইডিয়া। চারটি ঘোড়া চাই আমাদের।

ভয়ে ভয়ে আমি বললাম : আমার জন্যে ঘোড়ার দরকার নেই।

জুডিথ বললো : হেঁটে কি অত ওঠা-নামা করতে পারবে ?

বললাম : না পারলে ফিরে আসবো।

জেম্স হেসে বললো : তোমরা ভারি ভীরু তো !

আমিও হেসে বললাম : তোমরা বোলো না, বলো তুমি। নিজের দেশেও আমার ভীরু নাম।

শেষ পর্যন্ত তিনজনে তিনটি ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে গেল। আমি এগোলাম পায়ে হেঁটে। জেম্সের কাছ থেকে একটি মানচিত্র নিয়ে আমি এই অঞ্চলের সম্বন্ধে একটা ভালো ধারণা করে ফেলেছিলাম। এল্ টোভারের পিছন দিয়ে একটা পথ ব্রাইট এঞ্জেল ট্রেইলের পাশ দিয়ে ইণ্ডিয়ান গার্ডেনে পৌঁছেছে কলরেডো নদীর ধারে। তার পরে পূর্ব মুখে গেছে কাইবার সাস্পেন্সন ব্রিজের দিকে। যে পথ ধরে আমরা ডেসার্ট ভিউএ গিয়েছিলাম, তার নাম ঈস্ট রিম ড্রাইভ। তারই ধারে ইয়াকি পয়েণ্ট থেকে কাইবার ট্রেইলের পাশ দিয়ে আর একটা পথ এসেছে সাস্পেন্সন ব্রিজে। কলরেডো নদীর উপরে এই ব্রিজ পেরোলেই ফ্যাণ্টম র‍্যাঞ্চ।

আরও কয়েকটি বিস্ময়কর নাম দেখেছি জেম্‌সের একখানা বইএ। এই গ্র্যাণ্ড কেনিয়ানে অনেক হিন্দু নাম আছে—ব্রহ্মা টেম্প্‌ল, বিষ্ণু টেম্প্‌ল, শিব টেম্প্‌ল, তুর্গার নামে দেবী টেম্প্‌ল, কৃষ্ণ শ্রাইন, মনু টেম্প্‌ল ও রাণা শ্রাইন। এ সব নাম কে দিয়েছিল, কেন দিয়েছিল, তা এখানে জানবার উপায় নেই। জেম্‌স এ খবর জানে না। জানার কথাও নয়।

আমাদের হোটেলের কাছ থেকেই অনেক কিছু দেখতে পাওয়া যায়। তবু আমি আরও কিছু দেখবার জন্য ধীরে ধীরে এগিয়ে চললাম।

আশ্চর্য এই বনময় পার্বত্য পরিবেশ। তার চেয়েও আশ্চর্য বোধ হলো আমার এই অভিযান। কোথায় আমাদের বাঙলা, আর শত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে কোথায় এই আমেরিকার গ্র্যাণ্ড কেনিয়ান। ছেলেবেলায় যখন ভূগোলের বইএ এই নাম পড়েছিলাম, তখন কি জানতাম যে এখানে একদিন এমনি করে বেড়াতে পারবো!

মাঝে মাঝে তু একজন ইণ্ডিয়ান দেখতে পাচ্ছিলাম। ভারতীয় নয়, আমেরিকান তারা। সুগঠিত সবল দেহ, আর লাল মুখ। আমার দিকে কৌতূহল ভরে চেয়ে চেয়ে পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল। আর আমি ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে উঠছিলাম। পথের উপর থেকে একটা ধাক্কা দিয়ে যদি ফেলে দেয় তো কোন্ অতলে গড়িয়ে যাব জানি না। কলরেডোর জলেই হয়তো সমাধি হয়ে যাবে।

এই অঞ্চলের সম্বন্ধে আরও অনেক কথা জেম্‌সের বইএ দেখে নিয়েছি। আবহাওয়ার ব্যাপারে পৃথিবীতে যে সাতটি অঞ্চল আছে, তার মধ্যে ছটিই এখানে বর্তমান। গভীর খাদের ভিতরে উষ্ণ মরুভূমি অঞ্চল, আবার নিকটের সাড়ে বারো হাজার ফুট উঁচু সানফ্রান্সিস্কো পিকে সর্ববিধ আলপাইন অঞ্চলের অবহাওয়া। এখানে তাই নানারকমের জীবজন্তুও দেখা যায়। আট রকমের ম্যামাল, পঁচিশ রকমের রেপ্‌টাইল, পাঁচ রকমের অ্যাম্ফিবিয়ান ও প্রায় একশো আশি রকমের পাখি। আর এখানকার মানুষ হলো আদিম আমেরিকান। তাদেরও পাঁচটি ট্রাইব। যাদের দেখা পেয়েছি, রাতে হয়তো তাদেরই নাচ দেখতে পাব। কিন্তু কারও সঙ্গে এখনও আমার

পরিচয় হয় নি।

পরিচয় হলো অন্ধকার হবার পরে। সে এক আশ্চর্য পরিচয়। সমস্ত ঘটনা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।
অন্ধকার নামছে দেখে আমি আর এগোবার সাহস পেলাম না। সঙ্কীর্ণ পথ, দুটো ঘোড়া পাশাপাশি চললে তৃতীয় ঘোড়া উল্টো দিক থেকে আসতে পারবে না। অন্ধকারে ঘাড়ের উপরে কোনো ঘোড়া এসে পড়লেও দেখতে পাব না। আমি তাই পিছন ফিরে ফেরার পথ ধরেছিলাম।
কিছুক্ষণ পরেই একটা ঘোড়া উর্ধ্বশ্বাসে আমার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। ভয়ে আমি পাহাড় ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিলাম। পিছন থেকে এলো বলে আরোহীর মুখ আমি দেখতে পেলাম না, দেখলাম তার পিছনের দিকটা। মনে হলো যেন হ্যারিকেই দেখলাম। কিন্তু তার সঙ্গে আর কেউ নেই। পিছন ফিরেও আমি আর কাউকে দেখতে পেলাম না।
কেন জানি না, মনে একটা ভয়ের সঞ্চার হলো। হ্যারি এমন ব্যস্তভাবে কেন ছুটে গেল! আমাকে তো চিনতে পেরেছিল, কিন্তু কিছু বলে গেল না কেন।
তবে আমার কিছু করবার ছিল না। যেমন ধীর পদক্ষেপে ফিরছিলাম, তেমনি করেই ফিরতে লাগলাম।
অনেকক্ষণ পর আবার ঘোড়ার পায়ের শব্দ পেলাম। কিন্তু না, জেম্‌স ও জুডিথ নয়। অন্য লোক ফিরছে।
এমনি করে এক সময় জেম্‌স ও জুডিথও ফিরলো। খুব ধীরে ধীরে তারা এলো। দেখলাম যে একজন ইণ্ডিয়ান তাদের সঙ্গে আসছে।
আমার কাছাকাছি এসে জেম্‌স ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লো। জুডিথও নামলো। দ্রুত পায়ে আমার কাছে এসে জেম্‌স বললো : জুডিথকে আজ ভগবান বাঁচিয়েছেন।
জুডিথ তার পিছনেই ছিল, বললো : না, ভগবান নন। আমাকে বাঁচিয়েছে বব।
বলে সেই ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলো।

বললাম : কী হয়েছিল ?

জেম্‌স বললো : যা হয়েছিল, তুমি তা বিশ্বাস করবে না।

বললাম : নিশ্চয়ই করবো।

জেম্‌স বললো : জুডিথের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হ্যারি পিছিয়ে পড়েছিল। তারপর এক সময়ে তাকে ঠেলে ফেলে দিতে চেয়েছিল। বব কোথায় ছিল, আমরা দেখতে পাই নি। সে ধরে না ফেললে গ্র্যাণ্ড কেনিয়ানের অতল গহ্বরে আজ জুডিথের জীবন্ত সমাধি হয়ে যেত।

কিন্তু—

ভাবছো বন্ধুতার কথা ! তার চেয়েও বড় তার বর্ণবিদ্বেষ ! একটা কালো মেয়েকে আমি বিয়ে করবো, এ কাজ হ্যারি সমর্থন করতে পারে নি। হ্যাঁ, হ্যারি তার জাতকে পবিত্র রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু আমি তোমাকে একটা ভুল কথা বলেছি। ইণ্ডিয়ানরা নিষ্ঠুর নয়, তাদের মন আমাদের চেয়েও নরম। তা না হলে জুডিথকে বাঁচাবার জন্যে নিজের জীবন বব বিপন্ন করতো না।

জুডিথের দু চোখ ছলছল করে উঠেছিল। বললো : চলো, বব আজ আমাদের ঈগল ডান্স দেখাবে।

আমি কী উত্তর দেবো ভেবে পেলাম না। একজন সাদা ছেলে একটা কালো মেয়েকে বিয়ে করবে। এ কথা জেনে খুশী হয়েছে দু'জন ভারতীয়—একজন কালো আর একজন লাল। এ দেশের সাদা মানুষ এই মিলন সমর্থন করতে পারছে না। নিউ অর্লিয়ান্সের কালো ছেলে কি আমাকে ঠিক কথাই বলেছিল !

১৭

আমেরিকায় আমার অনেক দিন কেটে গেল। এইবারে ফেরার কথা মনে পড়ছে। হ্যাঁ, দেশে ফিরতে হবে আমাকে। বিদেশ বাসের মেয়াদ আমার ফুরিয়ে আসছে। অনেক কথাই তাই এখন আমার মনে পড়ছে। মনে

পড়ছে বিলের কথা। বিল আমার পুরনো বন্ধু নয়, সে আমার এ দেশের প্রথম বন্ধু। আমেরিকা যাত্রার প্রাক্কালে তাকে প্রথম দেখেছিলাম হীথরো এয়ারপোর্টে, তারপর প্লেনে পাশাপাশি বসে এদেশে উড়ে এসেছি। অনেক গল্প করেছি তার সঙ্গে, এ দেশ সম্বন্ধে অনেক কথা জেনেছি তার কাছে। ওয়াশিংটনে নেমে সে আমার সঙ্গে মলির পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। মলির সঙ্গে তার বিয়ে হবে, এ কথা আমাকে মলিই বলেছিল। বিয়েয় আমাকে নিমন্ত্রণ করবে বলে আমার অস্থায়ী ঠিকানাও নিয়েছিল। কিন্তু তাদের বিয়ের নিমন্ত্রণ আমি আজও পাই নি। দেশের চিঠি পেয়েছি দু একখানা। কিন্তু বিলের কোনো চিঠি পাই নি। আশ্চর্য না হলেও মাঝে মাঝে ভেবেছি তাদের কথা। আমি জানি যে বিয়েয় যোগ দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু একটা উপহার পাঠাবার ইচ্ছা ছিল। তাদের ঠিকানা তো নিয়ে রাখি নি, তাই তাদের সঙ্গে আর কোনোদিনই হয়তো যোগাযোগ করতে পারবো না। বিলের কথা মনে পড়লেই দুঃখ হয় এই জন্যে।

গ্র্যাণ্ড কেনিয়ান থেকে আমি আমেরিকার একেবারে শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছে গেছি। পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরের ধারে লস এঞ্জেল্‌সে। এখান থেকে সানফ্রান্সিস্কো হয়ে আমি দেশে ফিরবো। হাওয়াই দ্বীপের হনলুলুতে নামবো কয়েক ঘন্টার জন্য, তারপর জাপান। সেখান থেকে ভারতবর্ষ। মাঝে কোথায় নামতে হবে ঠিক জানি না।

প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে ক্যালিফোর্নিয়া একটি বড় স্টেট। সানফ্রান্সিস্কো তার রাজধানী, আর লস এঞ্জেল্‌স একটি বিশ্ববিখ্যাত শহর। চলচ্চিত্র ব্যবসায়ে এমন নাম করেছে যে আমেরিকায় এলে এই শহরে একবার আসতেই হবে, দেখে যেতে হবে হলিউডের স্টুডিওগুলো।

মানচিত্র দেখে আমার মনে হয়েছিল যে শহরটি বোধহয় সমুদ্রের ধারে। কিন্তু এখানে এসে জানলাম যে সমুদ্র শহর থেকে পনেরো মাইল দূরে। শহরে ছাব্বিশ লক্ষ লোকের বাস, আর শহরতলির বাসিন্দা নিয়ে জনসংখ্যা চুয়াত্তর লক্ষ। শহরটি এমন ছড়ানো যে আমার এক শুভানুধ্যায়ী

আমাকে সাবধান করে বলেছিলেন যে দূরত্ব না জেনে আমি যেন ট্যাক্সিতে না উঠি। এমন ছড়ানো শহর আমেরিকায় আর নেই।

আরও একটি বৈচিত্র্য আছে এই শহরের। ঠিক সানফ্রান্সিস্কোর মতোই উঁচু নিচু শহর। কোথাও সমুদ্রতলের সমান, কোথাও বা পাঁচ হাজার ফিটেরও বেশি উঁচু। মোটর নেই, তবু আমি একটা হোটেলে উঠেছিলাম। শুনেছিলাম যে হোটেলের চেয়ে মোটেলে খরচ কম। কিন্তু শুধু পয়সা বাঁচাবার জন্য নয়, কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করবার ইচ্ছাও ছিল। এক সময় বড় বড় শহরের ধারে সরাই-এর মতো ছোট ছোট আস্তানা গড়ে উঠেছিল। মোটরের যাত্রীরা এই সব আস্তানায় আশ্রয় নিত রাতে। দেখতে দেখতে এগুলোই এখন হোটেলের মতো বড় হয়ে উঠেছে। মোটর রাখবার জায়গা আছে ভিতরে। এরই নাম হয়েছে মোটেল। এখন এ দেশে যত হোটেল তত মোটেল। আর এই সব মোটেলে কোনো আরামেরই অভাব নেই। এ যুগের সব রকম স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা আছে। স্নানের জন্য সুইমিং পুলও আছে অনেক মোটেলে।

কিন্তু আমি এখানে সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য হলাম বিলকে দেখে। আমি তাকে প্রথমে দেখতে পাই নি। সে আমাকে আগে দেখেছিল, আর কতকটা ছুটে এসে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভাবে বলেছিল : হায়!

শুনে শুনে এই শব্দটা আমার ধাতস্থ হয়েছে। প্রথমে ভাবতাম হ্যাই বা হাই বলে, এখন দেখছি পরিষ্কার বাঙলা শব্দ হয়। তাই তৎপরভাবে হাত বাড়িয়ে আমি বললাম : হায় বিল!

প্রথম নামটা বললে এরা বেশি খুশী হয় দেখেছি, ভাবে যে তাকে নিজের লোক ভাবছি। কিন্তু আমাদের অভ্যাসে কিছু বাধে। আমরা মিস্টার বা মিসেস যোগ করে শেষ নামটা বলতেই অভ্যস্ত। বিশেষ করে বয়োজ্যেষ্ঠ-দের তো নাম ধরে কথা বলতেই পারি না। আর বুড়োরাও তা পছন্দ করবেন না। কিন্তু এ দেশে সে সব বালাই নেই। প্রথম নাম ধরেই ডাকাডাকির চল, তাই সেই নামটাই মনে রাখার দরকার বেশি।

এমন আবেগ নিয়ে সে আমার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করলো যে নিজের দেশ

হলে আমি হয়তো তাকে বুকে জড়িয়ে ধরতাম। বুকে জড়িয়ে ধরলে সে কী ভাববে, এই ভেবেই আমি নিরস্ত হলাম।
ভেবেছিলাম যে মলিকেও আমি তার সঙ্গে দেখতে পাব। হয়তো শুনবো যে তাদের বিয়ে হয়ে গেছে এবং এখানে এসেছে হ্যানিমুন করতে। কিন্তু না, মলিকে দেখতে পেলাম না। তার বদলে যাকে দেখলাম, তাকে আমি আগে কোথাও দেখি নি। এ একটি নতুন মেয়ে। কিন্তু বুঝতে ভুল হলো না যে এই মেয়েটিও তার বন্ধু। হয়তো নতুন বন্ধু। মলির জায়গায় এই মেয়েটি এসে কী করে উপস্থিত হলো, সেই কথা ভেবেই আমি বেশি আশ্চর্য হলাম। বিলের এ কী ছেলেখেলা বুঝতে পারলাম না।
কিন্তু বিল খুব সহজভাবে তার এই বন্ধুর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলো। এর নাম এথিল। বয়স কম, একটু রোগা। এ দেশের মাপকাঠিতে সুন্দর।
তারপরেই বিল আমাকে জিজ্ঞাসা করলো : হলিউড দেখতে এসেছ ?
বললাম : হ্যাঁ।
বিল বললো : শুটিং দেখতে তো পাবে না, বাইরেটাই তোমাকে দেখিয়ে আনবো।
তুমি দেখাবে !
বলে আশ্চর্য হয়ে আমি তার মুখের দিকে তাকালাম।
বিল বললো : এথিল একটা সুন্দর গাড়ি এনেছে। আর ও দিকে তার জানাশুনোও হয়েছে বেশ।
বলে গর্বিতভাবে একবার এথিলের দিকে আর একবার আমার দিকে তাকালো।
আমার মনে হলো যে এই মেয়েটি বোধহয় সিনেমা লাইনে কাজ পেয়েছে এবং সে কাজ অভিনয়ের। তা না হলে বিল এমন গর্ববোধ করতো না।
বললাম : তাহলে তো আমাদের খুব সুবিধা হবে।
বিল জিজ্ঞাসা করলো : কদিন থাকবে এখানে ?
বললাম : সানফ্রান্সিস্কো থেকে ফেরার দিন আমার ঠিক হয়ে গেছে। এখানে

আমি দিন তিনেক থাকতে পারি।

মাত্র!

হেসে বললাম : এ দেশে তো অনেক দিন কাটালাম! আর মায়া বাড়িয়ে লাভ কী!

বিল বললো : আমাদের দেশটা তোমার কেমন লাগলো, সত্যি করে বলতো!

বললাম : বিচিত্র।

মানে?

মানে এক জায়গার সঙ্গে আর এক জায়গার প্রভেদ এমন বেশি, যে কোন্‌টা সত্যি আর মিথ্যা কোন্‌টা, তা বুঝতেই পারলাম না।

মোটেলের লাউঞ্জে বসে আমাদের কথা হচ্ছিলো : এক দফা হেসে নিয়ে বিল বললো : ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলো।

বললাম : নিউ ইয়র্কে আমার মনে হয়েছিল যে আমেরিকার সর্বত্রই বুঝি এমন ব্যস্ত জীবন, এই রকম জীবন যাপন করতে হলে আমরা হাঁপিয়ে মরে যাব। তারপরে যখন একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে উপস্থিত হলাম, তখন দেখলাম যে সে একটা নতুন দেশ। কোনো তাড়াহুড়ো নেই, কোনো হৈ-চৈ নেই। শান্ত সমাহিত পরিবেশ আমাদের দেশের শান্তিনিকেতনের মতো। তখন এই কথাই আমার মনে হলো যে এখানকার ছেলেমেয়েরা বড় বড় শহরে গিয়ে বাঁচবে কেমন করে!

বিল বেশ উপভোগ করলো আমার কথা। বললো : আমরা এক লাফে এগোই না, এগোই ধাপে ধাপে। তুমি শুনে খুব আশ্চর্য হবে যে আমরা এক জায়গায় বেশিদিন থাকতেও ভালবাসি না। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাই। এক শহর থেকে আর এক শহরে। এক কাজ ছেড়ে আর এক কাজে চলে যেতেও দ্বিধা করি না। এই যাযাবর বৃত্তি নাকি এ দেশের একটা বৈশিষ্ট্য।

বললাম : তোমাদের এ কথা আমার জানা ছিল না, তাই তোমাদের স্বভাবের এই দিকটা আমি লক্ষ্য করি নি।

বিল বললো : বেশি দিন থাকলে তা নিজের চোখেই দেখতে পেতে।
এথিল অনেকক্ষণ থেকেই উসখুস করছিল। আমাদের কথা বোধহয় তার ভালো লাগছিল না। সে দিকে নজর পড়তেই বিল বললো : তুমি কি এখন বেরোতে চাও ?
এথিল বললো : সারাদিন কি ঘরে বসে গল্প করবে ?
লজ্জিতভাবে বিল বললো : তা কেন করবো ?
তারপরেই বললো : তবে কি জানো এথিল, কত দিন পর হঠাৎ এই ভারতীয় বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল এইখানে। আমি ভাবতেই পারি নি যে এমন ভাবে দেখা হয়ে যাবে। আর মাত্র তিন দিন পরেই ও আমাদের দেশ ছেড়ে চলে যাবে ! তাই—
বাধা দিয়ে এথিল বললো : সেইজন্যেই তো বলছি, ঘরে বসে গল্প না করে বাইরে কিছু দেখিয়ে দাও না !
বিল লাফিয়ে উঠে বললো : খুব ভালো আইডিয়া !
এথিল বললো : আমাকে একটু সময় দাও, আমি তৈরি হয়ে আসছি।
এথিল চলে যাবার পর বিল আবার বসে পড়লো। আর আমার মনে পড়লো আর এক দিনের কথা। তার অর্থ আমি বুঝতে পারি নি বলে আমার ভারি আশ্চর্য লেগেছিল সেই কথাটি। ভেবেছিলাম, কাউকে জিজ্ঞাসা করে তার মানে আমি জেনে নেবো। কিন্তু সে সুযোগ আজও পাই নি।
একটা হোটেলের ঘটনা। দিন কয়েক ছিলাম সেই হোটেলে। একটা রাত কাটাবার পরেই দেখলাম যে আমার অবর্তমানে কেউ এসে আমার ঘরটি নতুন করে সাজিয়ে রেখে গেছে। অন্য হোটেলেও তাই করে। শুনেছি যে ঘরের ডুপ্লিকেট চাবি থাকে চেম্বার মেডের কাছে। সময় মতো সে ঘর পরিষ্কার করে চাদর বালিশের ওয়াড় বদলে পরিপাটি করে সব সাজিয়ে গুছিয়ে রেখে যায়। কিন্তু যে হোটেলের কথা বলছিলাম, সেখানে দু একটা নতুন ফুলও রেখে যাচ্ছিল। একদিন ঘরে ফিরে দেখলাম যে টেবলের ওপরে কয়েকটা ডলার চাপা দেওয়া আছে অ্যাশ-ট্রের নিচে, তার সঙ্গে এক টুকরো কাগজ। তাতে লেখা—তোমার এই ডলারগুলো

খাটের নিচে পড়ে ছিল। আমি এই সততা দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম যে আমার কিছু একটা করা উচিত। একটা ডলার রেখে দিলাম মেয়েটার জন্যে। কিন্তু সন্ধ্যেবেলায় ঘরে ঢুকে আশ্চর্য হয়ে দেখলাম যে ডলারটি ঠিক একই জায়গায় আছে, কেউ তা ছোঁয় নি। প্রথমে ভাবলাম যে একটা কাগজে লিখে দেবো, এটা তোমার জন্যে। তাবপরে ভাবলাম যে হোটেল ছাড়বার সময়ে অফিসে তার জন্যে জমা দিয়ে যা'ব। কিন্তু তার পরের দিনই কী একটা কাজে অসময়ে হোটেলে এসেই মেয়েটিকে আমার ঘরে কাজ করতে দেখলাম। বললাম। তোমার জন্যে একটা ডলার রেখে গিয়েছিলাম, তুমি নাওনি কেন?

মেয়েটি অভিযোগ করলো, সে কথা তুমি তো লিখে রেখে যাও নি! আমি তা বুঝবো কী করে!

আমি লজ্জিত ভাবে বললাম, সত্যি কথা!

আর তখনই আমার পার্স থেকে একটা ডলার বার করে তার হাতে দিলাম। মেয়েটি তা নিয়ে আমাকে ধন্যবাদ জানালো।

আমি বললাম, সেদিন তুমি আমার ডলারগুলো খুঁজে দিয়েছিলে, তার জন্যে অনেক ধন্যবাদ।

এর উত্তরে মেয়েটি বলেছিল, ইউ আর ওয়েলকাম।

আমি চমকে উঠেছিলাম এই কথা শুনে। আমাকে স্বাগত জানাচ্ছে মেয়েটি। তার এই কথার অর্থ বুঝতে না পেরে আমি অস্বস্তি বোধ করেছিলাম অনেকক্ষণ। কিন্তু মেয়েটি খুব সহজভাবে ঘরের সব কাজ সেরে বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছিল। ভেবেছিলাম, কাউকে এই ওয়েলকামের মানে জিজ্ঞাসা করবো। কিন্তু সে রকমের কোনো বন্ধু না পেয়ে কথাটা জেনে নিতে পারি নি। আজ হঠাৎ মনে পড়ে গেল সেই কথা। আর এথিল চলে যেতেই বিলকে আমি বললাম: তোমার কাছে আমি একটা কথার মানে জানতে চাই।

বলো।

বলে বিল আগ্রহ প্রকাশ করলো।

বললাম : কাউকে ধন্যবাদ দিয়ে উত্তর পেয়েছিলাম, ইউ আর ওয়েলকাম। এর মানে কী বলতো !

বিল হেসে বললো : ওর কিছুই মানে নেই। তুমি যেমন ধন্যবাদ দিলে, ও তেমনি সেটা ফিরিয়ে দিলো। অন্য দেশে 'নো মেন্‌শন' বা 'নীড নট মেন্‌শন' বলতে শুনেছি, এখানে বলে 'ইউ আর ওয়েলকাম'। এর মানে এই সামান্য কাজের জন্যে ধন্যবাদ জানাবার কোনো প্রয়োজন নেই।

আমি যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচে গেলাম। মনে হলো যে এতদিন যেন একটা মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করছিলাম এই কথাটির মানে না জানার জন্যে।

তারপরেই আর একটি ঘটনা আমার মনে পড়লো। একদিন একটা রেস্তোরাঁয় খেয়ে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে এসেছিলাম। টেবলের ওপরে টিপ্‌স রেখে আসতে ভুলে গিয়েছিলাম সেদিন। এর আগে লক্ষ্য করে দেখেছিলাম যে যারা কিছু রাখে প্লেটের নিচে, তারা দেখিয়ে দেখিয়ে রাখে একটুখানি মিষ্টি হাসি দেখবার জন্যে। কিন্তু টিপ্‌স না দিয়ে বেরিয়ে গেলে যে পরের দিন খাবারের জন্যে অনেকক্ষণ বসে থাকতে হবে, তা বুঝতে পারি নি। আমি সেই পুরনো টেবলেই এসে বসেছিলাম। সবাই খাবার পাচ্ছিল, কিন্তু আমি পাচ্ছিলাম না। দেরি করেই সে আমাকে বুঝিয়ে দিলো যে আগের দিন আমি অন্যায় করে গেছি। তাই সেদিন বেরোবার আগে ক্ষতিপূরণ করে গেলাম আগের দিনের।

এ ঘটনা বিলকে বলবার মতো নয়। আমার ইচ্ছা করছিল মলির কথা জানবার। মলি তার সঙ্গে এলো না কেন ! মলি কি তাকে ছেড়ে গেছে, না সে ছেড়ে এসেছে মলিকে ! এ কথা জানতে পারলে তাদের সমাজের সম্বন্ধে একটা ধারণা আমি করতে পারি। কিন্তু ভয় হলো অসৌজন্য প্রকাশ হয়ে পড়বার। এথিল এসে পড়তে পারে বলেও ভয় হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত কৌতূহল চাপতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলাম : কবে বিয়ে করছো ?

বিল আমার মুখের দিকে তাকালো সন্দিগ্ধ ভাবে। তারপর প্রশ্নটা সরল মনের বুঝতে পেরে বললো : তুমি আমাদের হালচাল জানো না বলেই এই প্রশ্ন করলে।

আমি অপরাধীর মতো বলে উঠলাম : কিছু মনে কোরো না, সত্যিই আমি কিছু জানি না বলেই এই কথা জিজ্ঞেস করেছি।

বিল একবার তার চারধারটা দেখে নিয়ে বললো : সাধারণত আমরা খুব কম বয়সে কিছু না বুঝেসুঝেই একটা বিয়ে করে বসি। পড়াশুনো করবার সময়েই ভাব হয়, একটা সুযোগ পেলেই বিয়ে। কিন্তু এই বিয়ে বেশি দিন টেঁকে না, দু একবছর বাদেই ডিভোর্স হয়ে যায়। এতে বিয়ে সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা হয়ে যায়, তাই সহজে আর বাঁধা পড়তে চাইনে। এখন 'উই লিভ টুগেদার'। কখনও অল্প দিন, কখনও দীর্ঘ দিন একসঙ্গে থাকি। না বুঝে শুনে দ্বিতীয়বার বিয়ে করি না।

প্লেনে আসবার সময় বিল আমাকে ইউরোপের কোনো দেশের কথা বলেছিল। এমনভাবে বলেছিল যে আমি ভেবেছিলাম যে তাদের দেশে বুঝি সে রকম হয় না। এখন তার নিজের মুখে এই কথা শুনে বিস্মিত হলাম। আমরা এধরনের জীবন যাপনের কথা ভাবতেও পারি না।

এই ব্যাপারে আর একটি বেয়াড়া প্রশ্ন আমার মনে এলো। বিবাহ বিচ্ছেদ হবার পরে এইভাবে যে একত্র বাস করা যায়, তা বুঝতে পারছি। যাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয় নি, তারাও কি এইভাবে অপরের স্বামী বা স্ত্রীর সঙ্গে সংসার করতে পারে! কিন্তু এই নিয়ে কোনো প্রশ্ন করবার দুঃসাহস আমার হলো না! বিল হয়তো কিছুই মনে করবে না, কিন্তু আমার ভদ্রতায় বাধলো।

আমাকে নীরব দেখে বিল জিজ্ঞাসা করলো : তুমি নিশ্চয়ই ডিজ্‌নি ল্যাণ্ড দেখবে?

বললাম : দেখবার তো শখ ছিল, কিন্তু সম্ভব হবে কিনা জানি না।

বিল বললো : নিশ্চয়ই হবে। কাল আমরা ডিজ্‌নি ল্যাণ্ড দেখতে যাচ্ছি, তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব।

আমি ভদ্রতা করে বললাম : না না, আমার জন্যে তোমরা কষ্ট করবে কেন?

কষ্ট! কষ্ট কিসের?

ঠিক এই সময়েই এথিল এসে উপস্থিত হলো। আর বিল তাকে দেখেই বলে উঠলো : আমাদের ইণ্ডিয়ান বন্ধু কী বলছে জানো ? ডিজ্‌নি ল্যাণ্ডে ওকে নিয়ে গেলে নাকি আমাদের কষ্ট হবে !

এথিল এক রকমের অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গি করে বললো : একটুও না।

অতএব ডিজ নি ল্যাণ্ডে যাওয়া আমাদের স্থির হয়ে গেল পরের দিন। বেশ প্রসন্ন মনে আমি বিল ও এথিলের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। এথিল আমাদের একটা ঝকঝকে গাড়ির কাছে নিয়ে গেল। এথিলকে স্টিয়ারিঙে বসতে দেখেই বুঝতে পারলাম যে এটা তারই গাড়ি। অন্য ধার থেকে বিলকে সে আগে তুলে দিয়েছিল, তারপরে আমাকে। ঘুরে গিয়ে সে বসলো বিলের পাশে। এত বড় গাড়ি যে পিছনে বসবার দরকার হয় না।

বিল সগৌরবে বললো : শহরটা দেখিয়ে হলিউডে চলো।

এথিল একটু হাসলো, কিন্তু কোনো কথা বললো না।

মোটেলের বাইরে বেরোতেই বিল আমাকে বললো : কী দেখবে বলতো ?

এথিল বললো : অ্যাকোয়েরিয়াম মিউজিয়ম পার্ক গার্ডেন—এই সব দেখবে ?

বিল আমার দিকে তাকালো।

আমি বললাম : এ সব তো সব জায়গাতেই আছে, এ সব দেখবার আগ্রহ আমার নেই। এখানকার যা বৈশিষ্ট্য, তা দেখতে পেলেই আমি বেশি খুশী হব।

এথিল বললো : তবে চলো, তোমাকে স্প্যানিশ পাড়া আর চায়না টাউন দেখাই।

বলে আমাদের সে যেখানে নিয়ে এলো, তার নাম ওল্ড ভেরা স্ট্রীট। এখানকার দোকানপাট ও রেস্তোরাঁয় স্প্যানিশ জীবনযাত্রার নমুনা। এথিল বললো : সন্ধ্যেবেলায় এই অঞ্চলটা আরও ভালো লাগবে।

চায়না টাউনের দিকে যাবার সময় বিল বললো : চাইনিজ খাবার তোমার কেমন লাগে ?

বললাম : সত্যি বলতে কি, আমার তেমন ভালো লাগে না।

এথিল বললো : তবে থাক। আজ আমরা ফার্মার্স মার্কেটে বাইরে বসে

খাব। বেশ মজা লাগবে তোমার।

বিল এথিলকে বললো : পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট রেলওয়েটা দেখাবে না?

এঞ্জেলস ফ্লাইটের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।

বলে এথিল সেদিকেই চললো।

থার্ড ও হিল স্ট্রীটের মোড়ে এই এঞ্জেলস ফ্লাইট। মাত্র পাঁচ সেণ্ট দিয়ে এই রেলে চড়তে হয়।

সেখান থেকে আমরা ফার্মার্স মার্কেটে গিয়ে খোলা আকাশের নিচে বসে লাঞ্চ খেলাম। এখানকার জনপ্রিয় খাবার হলো গ্রিল্ডমীট, স্যালাড, তাজা সব্জি ও ফল। অ্যাপেটাইজার হিসাবে পাওয়া যায় সিজার স্যালাড।

এথিল বললো : এই শহরে চানা জাপানী স্প্যানিশ ও ফ্রেঞ্চ খাবারের খুব কদর। তবে ফ্রেঞ্চ রেস্তোরাঁয় খাবারের দাম অসম্ভব বেশি।

অনেকদিন পরে এইভাবে বাইরে বসে খেতে খুব ভালো লাগলো। আমার প্রসন্নতা লক্ষ্য করে বিল বললো : জানো, আর কয়েকটা দিন আগে এলে তোমাকে এমনি খোলা আকাশের নিচে বসিয়ে থিয়েটার দেখাতে পারতাম।

আমি বললাম : মুক্তাঙ্গন থিয়েটার আমাদের দেশেও [illegible] হয়েছে।

সত্যি নাকি!

বললাম : সে তেমন বড় কিছু নয়।

বিল একটু সংযতভাবে বললো : এখানে হলিউড বোলে আমার কনসার্ট হয়। খোলা আকাশের নিচে স্টেজ। আর দর্শকদের বসবার জায়গা এমন ভাবে করা হয় যে অসংখ্য লোক এক সঙ্গে দেখতে পারে। এ রকম থিয়েটার এ দেশে অনেক আছে, কিন্তু এখানকার মতো বিরাট ও জনপ্রিয় কনসার্ট আর কোথাও নেই। জুলাই অগস্টে এলে দেখতে পেতে।

এথিল বললো : ডিজ্‌নি ল্যাণ্ডেরও সীজন আছে।

কি রকম?

বলে আমি এথিলের মুখের দিকে তাকালাম।

এথিল বললো : সেপ্টেম্বরেই বন্ধ হয়ে যাবে ডিজ্‌নি ল্যাণ্ড, মে মাসে আবার

খুলবে। যদি লস্ এঞ্জেলস্ এন্‌জয় করতে চাও তো তোমাকে মে থেকে জুলাই-এর মধ্যে আসতে হবে।

খেয়েদেয়ে আমরা হলিউডে চলে গেলাম। আমাদের সঙ্গে কোনো লেটার অফ ইণ্ট্রোডাকশন ছিল না বলে কোনো স্টুডিয়োয় ঢুকে ছবি তোলা দেখতে পেলাম না। তবু বাইরে থেকেই কিছু দেখা গেল। আশ্চর্য হলাম একটা রাস্তা দেখে। খুব চেনা মনে হলো এই রাস্তাটি। বিল সকৌতুকে বললো : এই রাস্তাটা তোমার চেনা মনে হচ্ছে, তাই না ?

বললাম : এই ঘর বাড়িগুলোও।

বিল বললো : এটা নিউ ইয়র্কের একটা রাস্তা। নিউ ইয়র্কে গিয়ে শুটিং করা তো সহজ ব্যাপার নয়, তাই এই নকল নিউ ইয়র্ক তৈরি করে রাখা হয়েছে।

আরও অনেক জিনিস দেখলাম, শুনলামও অনেক গল্প। সে সমস্ত বলতে গেলে একটা মহাভারত হয়ে যাবে। হলিউডই তো একটা জগৎ। সে জগতের সব কিছুই আমাদের কাছে স্বপ্নলোকের মতো।

সন্ধ্যায় অন্ধকার গভীর হবার আগেই আমরা আমাদের মোটেলে ফিরে এলাম।

১৮

পরদিন সকালবেলায় আমরা যাত্রা করলাম ডিজ্‌নি ল্যাণ্ড। লস্ এঞ্জেল-সের নিকটে অ্যানাহিম নামে এক জায়গায় এই পরীর দেশ ডিজ্‌নি ল্যাণ্ড। পথে যেতে যেতে বিল বললো : কাল আমরা এখানে আসি নি কেন জানো ?

বললাম : জানি না।

বিল বললো : সোম আর মঙ্গলবার ডিজ্‌নি ল্যাণ্ড বন্ধ থাকে, খোলা থাকে সপ্তাহের বাকি পাঁচ দিন।

এথিল হেসে বললো : এ তোমার বই পড়া জ্ঞান।

কেন ?

সেখানে পৌঁছলেই একটা ছাপা প্রোগ্রাম পাবে। তাতে বড় বড় করে লেখা থাকবে, এই গ্রীষ্মে ডিজ্‌নি ল্যাণ্ড রোজ খোলা থাকবে সকাল আটটা থেকে রাত একটা পর্যন্ত। কোন্ দিন কী বিশেষ দ্রষ্টব্য আছে তাও জানতে পারবে।

লজ্জিত ভাবে বিল বললো : আমি জানতাম না।

তারপর সে আমাকে ডিজ্‌নি ল্যাণ্ড সম্বন্ধে অনেক কথা বললো। বললো : ওয়াল্ট ডিজ্‌নির নাম নিশ্চয়ই জানো ?

বললাম : মিকি মাউস তো ! খুব ভালো জানি তাঁকে।

বিল হেসে বললো : এখনও ছোট ছেলেমেয়েরা ডিজ্‌নি ল্যাণ্ডে গিয়ে টেলিফোনে জিজ্ঞেস করে, মিকি মাউসের সঙ্গে একবার কথা বলতে পারি ? টেলিফোন অপারেটর তখনই জবাব দেয়, সে এখন একটু ঘুমোচ্ছে।

প্রশস্ত রাজপথ ধরে আমরা ছুটে চলেছিলাম। লস্ এঞ্জেল্‌স থেকে সাতাশ মাইল দূরে অ্যানাহিম আমাদের গন্তব্যস্থল। খুব প্রশস্ত এই রাজপথ। পাশাপাশি কয়েকখানা গাড়ি একসঙ্গে ছুটতে পারে। আমেরিকার রাজপথ সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা নেই। এক পথে একই গতিতে সব গাড়ি ছোটে না। প্রত্যেকটি লেনের গতি নির্ধারিত করা আছে। যারা যত বেগে ছুটতে চায়, তারা সেই লেন ধরবে। মোড় নেবার ব্যবস্থাও খুব মজার। দূরে দূরে পদ্মফুলের মতো জ্যামিতির নক্সা করা রাস্তা আছে। সেই নক্সায় ঘুরপাক খেয়ে নিজের পথটি বেছে নিতে হবে।

এ সব দেশে যে কত বেগে গাড়ি চলে তাও আমাদের ধারণার অতীত। পথে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে বাঁচার আশা নিতান্তই কম। আর একসঙ্গে একটা গাড়ির দুর্ঘটনা ঘটে না, পর পর কয়েকখানা গাড়ি সেই দুর্ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে। একটা গাড়ির চাকা ফেটে যদি সেটা পথরোধ করে তো তার পিছনে আরও কয়েকখানা গাড়ি এসে তার উপরে পড়ে দলা পাকিয়ে যায়। গাড়ির বেগ এত যে দেখতে পেয়েও গাড়ি থামানো সম্ভব হয় না।

এথিল নিঃশব্দে গাড়ি চালাচ্ছিল। আর আমি বিলকে জিজ্ঞাসা করলাম :

কত দিনের পুরনো এই ডিজ্‌নি ল্যাণ্ড?

বিল ভাবলো একটুখানি, তারপরে বললো: মনে হচ্ছে, ১৯৫৫ সাল থেকে লোকে এখানে আসছে। কিন্তু শুনেছি, ডিজ্‌নি কুড়ি বছর ধরে এর পরিকল্পনা নিয়ে মেতে ছিলেন।

ওয়াল্ট ডিজ্‌নি তো এখন বেঁচে নেই?

না, ১৯৫৫ সালে তিনি মারা গেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে তাঁর জীবিত কালে দশ এগারো বছরে ছ কোটি লোক এই ডিজ্‌নি ল্যাণ্ড দেখেছে। কত দেশের রাজা মহারাজা প্রেসিডেন্ট প্রাইম মিনিস্টার ও বিশিষ্ট লোক যে এ জায়গা দেখে গেছেন। তার কোনো হিসেব নেই। ডিজ্‌নি নিজেও নাকি ঘুরে ঘুরে অনেককে এই জায়গা দেখিয়েছেন। আর তখনই তিনি মনে করেছিলেন যে তাঁর স্বপ্ন ও পরিকল্পনাকে রূপ দেবার জন্যে জায়গাটা খুবই ছোট। এত অল্প জায়গায় একটা বিশ্ব রচনা সম্ভব নয়। একটা কাল নয় দুটো কাল তাঁকে দেখতে হয়েছে—ইয়েস্টারডে ও টু-মরো। কী ছিল। আর কী হবে। বিজ্ঞানের যত উন্নতি হচ্ছে, কী হবের জগৎ ততই বেড়ে যাচ্ছে। তাই মৃত্যুর পূর্বে ওয়াল্ট ডিজ্‌নি এর চেয়েও বড় একটা পরিকল্পনায় হাত দিয়েছিলেন।

এর পরেই বিল আমাকে জিজ্ঞাসা করলো: তুমি ফ্লোরিডায় যাও নি?

বললাম: ফ্লোরিডার মায়ামি বীচে গিয়েছিলাম।

বিল সচকিত হয়ে বললো: ওয়াল্ট ডিজ্‌নি ওয়ার্ল্ড দেখে আস নি?

আমি সত্যি কথাই বললাম: তার খবর আমার জানা ছিল না।

ইস্‌!

বলে বিল আফশোস প্রকাশ করলো। বললো: ওয়াল্ট ডিজ্‌নি ওয়ার্ল্ড পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আকর্ষণীয় স্থান হতে যাচ্ছে। কিন্তু এখানকার নকল নয়। সে একেবারে নতুন জগৎ। এর আকার কত বড় জানো?

বললাম: জানি না।

নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটন দ্বীপের ডবল, মানে প্রায় তেতাল্লিশ স্কোয়ার মাইল, একরের হিসেবে সাতাশ হাজার একর। কয়েকটা ফেজ্‌-এ তৈরি

হচ্ছে। প্রথম ফেজ খোলা হয়েছে ১৯৫৫ সালের ১লা অক্টোবর। তার নাম ভেকেশন কিংডম। হোটেল রিসর্টগুলিই আগে তৈরি হয়েছে। অবসর যাপনের জন্য লোকজন এলে যেন নতুন জীবন লাভ করে। এই রকম ব্যবস্থা।

কথায় কথায় আমরা ডিজ্‌নি ল্যাণ্ডে এসে পৌঁছে গেলাম।

এ এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা। না দেখলে এমন জায়গা কল্পনা করা যায় না। এ কোনো ছেলে ভোলানো ব্যাপার নয়। যে কোনো পরিণত বয়সের নরনারীকে এ জায়গা আকর্ষণ করবে।

প্রথমেই আমি এ সপ্তাহের একটা প্রোগ্রাম সংগ্রহ করে এ জায়গার বিষয়ে একটা মোটামুটি ধারণা করে নেবার চেষ্টা করলাম। কখন কোথায় কী মজার ব্যাপার হবে, তারই প্রোগ্রাম। এর সঙ্গেই ডিজ্‌নি ল্যাণ্ডের একটা নক্সা আছে।

মাঝখানে মেইন স্ট্রীট ; তারই উপরে টাউন স্কোয়ার ও ফ্ল্যাগ পোল। এই-খান থেকেই আমরা যাত্রা শুরু করলাম। পায়ে হেঁটে এগিয়ে গিয়ে পৌঁছ-লাম মেইন স্ট্রীটের অন্য প্রান্ত প্লাজায়। ডিজ্‌নি ল্যাণ্ডের মধ্যস্থল হলো এটি। সামনে একটি মধ্যযুগের কাস্‌ল। আর এক এক ধারে এক একটি দেশ। সব চেয়ে বাঁয়ে অ্যাড্‌ভেঞ্চার ল্যাণ্ড, তারপরে নিউ অর্লিয়ান্স স্কোয়ার, বিয়ার কান্ট্রি ও ফ্রন্টিয়ার ল্যাণ্ড। মধ্যযুগের কাস্‌লটি ফ্যাণ্টাসি ল্যাণ্ডে। আর সবচেয়ে ডালো দিকে টু-মরো ল্যাণ্ড।

ডিজ্‌নি ল্যাণ্ডে একটি সুন্দর স্টেশন আছে। তার গায়ে লেখা সাণ্টা ফি ও ডিজ্‌নি ল্যাণ্ড রেলরোড। খেলার গাড়ি। সেই গাড়িতে চেপে সবাই বেড়াতে যাচ্ছে। মেন স্ট্রীট দিয়ে ঘোড়ায় টানা ট্রাম চলে। পিছনে দেখতে পাওয়া যায় সেই পুরনো কাস্‌ল। আবার ব্যাণ্ড পার্টিও চলে এই রাস্তা ধরে, সামনে লাঠি হাতে ব্যাণ্ড মাস্টার হলো ডোনাল্ড ডাক।

যত গাছ পালা, তত ফল, লেক নদী ঝর্না, কোনো কিছুরই অভাব নেই। জলে স্টীমার লঞ্চ নৌকো ও জাহাজ আছে, পুরাকালের জাহাজ ও এ কালের সাবমেরিন। জাহাজে চড়ে বেড়াতে বেরোলে বিরাট আকারের

জলজন্তু দেখা যায়। আবার সাবমেরিনে চড়ে জলের নিচে চলে গেলে সুন্দর মারমেড ও মণিমুক্তার রত্ন ভাণ্ডার দেখতে পাওয়া যায়। শুধু জলে স্থলে নয়, রোপওয়েজে চেপে আকাশ পথেও বেড়ানো যায়।

এর পরেও আছে নিউ টু-মরো ল্যাণ্ড। এখানে যত সব অতি আধুনিক ব্যাপার। ভবিষ্যতে যা তৈরি হতে পারে, এখানে দেখানো হয়েছে সেই সব জিনিস। না বুঝিয়ে দিলে সে সব ভালো বোঝা যায় না। তবে আধুনিক যানবাহনে চড়ে হুসহাস করে বিপদসঙ্কুল স্থান পেরোতে গা শিরশির করে সারাক্ষণ।

এখানকার রেলে চড়ে গ্র্যাণ্ড কেনিয়ানও দেখা যায়। প্রায় একই রকমের দৃশ্য। ট্রেনের জানালা দিয়ে দেখে রোমাঞ্চ হয়।

ইট্‌স এ স্মল ওয়ার্ল্ড নামে এখানে একটা অদ্ভুত বাড়ি আছে। এর বহির্গাত্রে নাকি পৃথিবীর সব জায়গার স্থাপত্য-শিল্পের নমুনা। আর একটি বাড়ি আছে, তার নাম হন্টেড ম্যানসন, মানে ভূতুড়ে বাড়ি। বাইরে থেকে তার নীল রঙ দেখেই মনে হয় যে ভিতরে ঢুকলে গা ছমছম করবে।

এথিল বললো : দিনের চেয়ে রাতের ডিজ্‌নি ল্যাণ্ড আরও সুন্দর, আরও স্বপ্নময়।

মনে হলো যে এ খুবই ঠিক কথা। চারিদিকে যখন নানা রঙের বাতি জ্বলে উঠবে, তখন একে আর বাস্তব বলে মনে হবে না। মনে হবে একটা স্বপ্নের রাজ্য। সেইভাবেই যে এর পরিকল্পনা করা হয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর সেই জন্যেই এই ডিজ্‌নি ল্যাণ্ড রাত একটা পর্যন্ত খোলা থাকে।

বিল আমাকে বললো : ডিজ্‌নি ল্যাণ্ড সম্বন্ধে কয়েকটা কথা তুমি বোধহয় জানো না।

কী কথা ?

বলে আমি তার মুখের দিকে তাকালাম।

বিল বললো : এক শো ষাট একর জমির ওপরে এই ডিজ্‌নি ল্যাণ্ড তৈরি হয়েছে। আগে এই জমিতে কমলা লেবুর বাগান ছিল—পনের হাজার

গাছ। আড়াই হাজার লোক ছুই শিফ্টে কাজ করে এটি তৈরি করেছে। তারপরেই জিজ্ঞাসা করলো : এখানে কত লোক আছে জানো ?

বললাম : জানি না।

বিল বললো : ছ হাজার। এর মধ্যে কিছু অবশ্য পার্ট টাইম কর্মী আছে। গত বছর নব্বুই লক্ষ লোক এসেছিল ডিজ্নি ল্যাণ্ড দেখতে। এ জায়গা দেখে না গেলে তোমার মনে ছুঃখ থেকে যেতো।

বললাম : খুবই সত্যি কথা।

তারপরেই হঠাৎ লক্ষ করলাম যে এথিল আমাদের পাশে নেই। চারি-দিকে চেয়েও তাকে আমরা দেখতে পেলাম না।

কিন্তু বিলকে আমি মোটেই উদ্বিগ্ন দেখলাম না। আমিই শুধু চিন্তিত হয়ে বললাম : সে কোথায় গেল বলতো !

গম্ভীরভাবে বিল বললো : সিটি হলে চলে যাও। ওদের খবর দিলে ওরা অ্যানাউন্স করবে—

বলেই হাসলো।

বললাম : হাসলে কেন ?

বিল বললো : ওরা ছেলেমেয়ে হারিয়ে গেছে বলে না, বলে বাপ-মা হারিয়ে গেছে। এই সিটি হলে এসে তারা বসে আছে।

আমারও হাসি পেল। কিন্তু আমি এথিলের জন্যেই উদ্বিগ্ন হয়েছিলাম বেশি। সে-ই আমাদের এখানে এনেছে তার গাড়িতে, তার সঙ্গেই আমাদের ফেরবার কথা।

আমার চিন্তা দেখে বিল দার্শনিকের মতো বললো : শুধু এই ব্যাপারেই আমরা তোমাদের মতো দার্শনিকের জাত।

মানে !

মানে ?

বলে বিল অদ্ভুত ভাবে হাসলো। তারপরে বললো : ভাবনা কিসের বন্ধু ! এমনি করেই এক-একজন হারিয়ে যায়। তার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হয় সব সময়। একজন যায়। আর একজন আসে। যত দিন যৌবন আছে,

ততদিন তোমার কোনো ভাবনা নেই। তারপর বার্ধক্য এলে তোমার জন্যে আছে ওল্ড হোম। সেখানেও তুমি একজন সঙ্গী পেয়ে যাবে। এই তো জীবন!

বলে বিল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

হীথরো এয়ারপোর্টের পেগি হক্সওয়ার্থের কথা আমার মনে পড়লো, মনে পড়লো তার সেই চিঠির কথা। বিলের জন্য সে অপেক্ষা করছে। ওয়াশিংটনের মলির কথাও মনে পড়ে গেল। বিল তাকে বিয়ে করবে, এই আশা নিয়ে আছে সেই মেয়েটি। এথিল বিলকে নিয়ে কী করবে, তা আমাকে বলে নি। সে কি হারিয়ে গেল, না আবার সে ফিরে আসবে!

বিলের কথাও আমি ভাবলাম। আমেরিকার সব পুরুষই কি বিলের মতন, না বিল এদেশে শুধু একজনই! এত বড় একটা দেশে একটা বিল হতে পারে না। এই রকমের পুরুষ এদেশে হয়তো আরও অনেক আছে। অন্য দেশেও আছে। আমাদের দেশেও কি বিলের মতো পুরুষের অভাব আছে!

এইখানেই শেষ করা যাক অন্য এক দেশের কথা।